পার্টনার ফিল্ড স্কুল (পিএফএস) - ধান

# প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন এন্টারপ্রেনরশিপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়

# পিএফএস-ধান প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

রচনা ও সংকলন
মৃত্যুঞ্জয় রায়
পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ, পিসিইউ, পার্টনার ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা

কারিগরী সহযোগিতা
ড. গৌর গোবিন্দ দাশ
এপিডি, এপিসিইউ, পার্টনার

পরামর্শক
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর
পার্টনার, ডিএই

প্রকাশকাল
এপ্রিল ২০২৪

মুদ্রণ
মোনার্ক সলিউশন
২৫/৫ শান্তিবাগ, ঢাকা ১২১৭

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও প্রচার
প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্টাপ্রেনরশীপ অ্যান্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার),
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
কৃষি মন্ত্রণালয়

এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল শুধুমাত্র অ-বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উৎস উল্লেখসহ পুনরুৎপাদন ও ব্যবহার করা যাবে

*This document can be copied or reproduced for non-commercial use only provided that mention is made of the source*

## সূচিপত্র


| দিন | সেশন | বিষয়/ কার্যক্রম | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ০১ | ১ | পার্টনার ও ধানের পার্টনার মাঠ স্কুল সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা এবং নিয়ম কানুন | ০৩ |
| | ২ | প্রাক মূল্যায়ন (বিবিটি) | ০৫ |
| | ৩ | দল গঠন, নামকরণ ও দলনেতা নির্বাচন | ০৭ |
| ০২ | ৪ | ধানের সম্প্রতি উদ্ভাবিত সাম্প্রতিক জাতসমূহ ব্যবহারের গুরুত্ব, ধান পিএফএস মডিউলের প্রধান প্রধান বিষয় পরিচিতি | ০৮ |
| | ৫ | দলীয় গতিময়তা ও জড়তা ভাঙ্গা | ০৯ |
| | ৬ | ধানের নতুন জাত পরিচিতি ও নতুন জাতের বীজ উৎপাদন ব্যবসায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি | ১০ |
| | ৭ | পরিবেশসম্মতভাবে, লাভজনক ও নিরাপদ ধান উৎপাদনের মূল কৌশল | ১২ |
| | ৮ | কৃষকদের নিয়ে অংশগ্রহণমূলক শিখন প্লটের রূপায়ণ ও শিখন প্লট স্থাপন নিশ্চিতকরণ | ১৫ |
| ০৩ | ৯ | অঙ্কুরোদ্গম পরীক্ষা স্থাপন ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি | ১৭ |
| | ১০ | ধানের বীজতলা তৈরি, বীজ বপন ও চারার পরিচর্যা | ১৮ |
| | ১১ | ধানের ভালো চারার বৈশিষ্ট্য ও চারা পরিবহণ, এবং চারা রোপণ কৌশল | ১৯ |
| ০৪ | ১২ | ধান ফসলে সবুজ সার ও জৈবসারের পরিচিতি, সার ব্যবস্থাপনা ও আইপিএনএস | ২১ |
| | ১৩ | সেচ সাশ্রয়ী এডব্লিউডি পদ্ধতিতে ধান ফসলের সেচ ব্যবস্থাপনা | ২৩ |
| | ১৪ | ধানের উপকারী ও অপকারী পোকামাকড় সংগ্রহ, বাছাই ও শনাক্তকরণ | ২৫ |
| | ১৫ | ধানখেতের কৃষি পরিবেশ বিশ্লেষণের ধারণা প্রদান ও এর মাধ্যমে বালাই ব্যবস্থাপনার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কৌশল সম্পর্কে আলোচনা | ২৭ |
| ০৫ | ১৬ | ধানখেতের আগাছা পরিচিতি ও তার সমন্বিত দমন | ২৯ |
| | ১৭ | ধানের রোগের লক্ষণ বা নমুনা সংগ্রহ, বাছাই ও শনাক্তকরণ | ৩১ |
| | ১৮ | কৃষকদের ধানখেতের রোগ ব্যবস্থাপনা | ৩২ |
| ০৬ | ১৯ | ধানখেতে উপকারী জীব সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং সেগুলোর বংশবৃদ্ধি ও লালন-পালন করা | ৩৪ |
| | ২০ | নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা | ৩৬ |
| ০৭ | ২১ | মাসিক সভা, সঞ্চয়, ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনা ও অন্যান্য সাংগঠনিক কাজ | |
| | ২২ | ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টার কী? এ থেকে কীভাবে কৃষকরা সহায়তা পেতে পারে ও পিএফএস কৃষকদের আয়বর্ধনমূলক কাজ কী কী হতে পারে, ভবিষ্যত পরিকল্পনা | ৩৮ ৪০ |
| ০৮ | ২৩ | কৃষকদের ধানখেতের বর্তমান পোকা ব্যবস্থাপনা | |
| | ২৪ | জৈব বালাইনাশক পরিচিতি, তৈরি ও ব্যবহার কৌশল | ৪২ ৪৪ |
| ০৯ | ২৫ | ধান কাটা, মাড়াই, ঝাড়াই ও সংগ্রহোত্তর অন্যান্য ব্যবস্থাপনা এবং মজুত | |
| | ২৬ | ধানের বাজার সংযোগ তৈরি, মূল্য সংযোজন, বাণিজ্যিকীকরণ ও বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন | ৪৬ ৪৮ |

## সেশন ০১ পার্টনার ও ধানের পার্টনার মাঠ স্কুল সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা এবং নিয়মকানুন

**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

সহায়তাকারী সকল অংশগ্রহণকারী কৃষক-কিষানিদের উপস্থিতি সময়মতো নিশ্চিত করে সকলকে অর্ধচন্দ্রাকারে বা 'ইউ' আকারে বসাবেন ও পরস্পর পরিচিত হবেন। তিনি কোথা থেকে এসেছেন, কেন এসেছেন, পিএফএস কী, কেন, কীভাবে করা হবে, সহায়তাকারী কারা, সহায়তাকারীরা কৃষকদের কীভাবে সহায়তা দেবেন, উপজেলা কৃষি অফিসের ভূমিকা কী হবে, এ পিএফএস-এর নিয়মকানুন কী, প্রকল্প থেকে কৃষকরা কী কী পরামর্শ সেবা, সহায়তা বা উপকরণ পাবেন, এ স্কুলের মাধ্যমে কৃষকদের কী লাভ হবে, ইত্যাদি বিষয়ে এই সেশনে আলোচনা করবেন। আলোচনা হবে পারস্পরিক অংশগ্রহণমূলক।

### সেশন সহায়িকা

**এই সেশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সহায়তাকারী বলবেন-**

* আপনারা আজ এ সেশনে পার্টনার সম্পর্কে জানতে পারবেন ও
* যে পার্টনার ফিল্ড স্কুলে আপনারা প্রশিক্ষণের জন্য এসেছেন সে স্কুল ও স্কুলের নিয়মকানুন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

**পার্টনার সম্পর্কে সাধারণ ধারণা**

**প্রোগ্রামের নাম:** প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রাপ্রেনরশিপ অ্যান্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার)

**উদ্যোগী মন্ত্রণালয়:** কৃষি মন্ত্রণালয়

**বাস্তবায়নকারী সংস্থা:** (১) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) - লিড এজেন্সী, (২) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), (৩) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম), (৪) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), (৫) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), (৬) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), (৭) বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)।

**স্ট্রাটেজিক পার্টনার:** বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারটান), বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিডব্লিউএমআরআই), মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই), তুলা উন্নয়ন বোর্ড (সিডিবি), বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) ও হর্টেক্স ফাউন্ডেশন।

**বাস্তবায়ন মেয়াদ:** জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৮

**প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):** মোট ৬৯১০৯৩.১২

**অর্থায়নে:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংক ও ইফাদ

**প্রকল্পের আর্থিক পদ্ধতি:** প্রোগ্রাম ফর রেজাল্টস ফাইন্যান্সিং (পি ফর আর)

**কর্ম এলাকা:** পার্টনার প্রকল্পটি ৮টি বিভাগ, ১৪টি অঞ্চল, ৬৪টি জেলা এবং ৪৯৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হবে।

**লক্ষ্য:** পার্টনার প্রোগ্রামের সার্বিক লক্ষ্য হলো খোরপোষ কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরের মাধ্যমে দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

**প্রধান কার্যক্ষেত্রসমূহ:** প্রোগ্রামটি মূলত তিনটি কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হবে, যেখানে ১০টি ডিএলআই সূচক রয়েছে, যার আওতায় আবার ২৪টি ডিএলআর সূচক আছে-

**কার্যক্ষেত্র ১: টেকসই ও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন**

**ডিএলআই-১:** ফল ও সবজির জন্য উত্তম কৃষিচর্চার ধাপসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

**ডিএলআই-২:** উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ

**ডিএলআই-৩:** ধান ব্যতীত অন্যান্য দানাদার শস্য, ডাল, তেল ও উদ্যান ফসলের মাধ্যমে শস্য বহুমুখীকরণ

**ডিএলআই-৪:** আধুনিক সেচ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ

**কার্যক্ষেত্র ২: ভ্যালু চেইন সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের মান উন্নয়ন**

**ডিএলআই-৫:** কৃষক স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি সেবা সম্প্রসারণ

**ডিএলআই-৬:** বীজ প্রত্যয়নের অ্যাক্রিডিটেশন সিস্টেম ও নিরাপদ খাদ্য পরীক্ষা পদ্ধতি জোরদারকরণ

**ডিএলআই-৭:** নারী ও তরুণ কৃষি উদ্যোক্তাদের উদ্যোগগুলোকে বিকশিত করা

**কার্যক্ষেত্র ৩: সরকারি কৃষি প্রতিষ্ঠান আধুনিকীকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলিকে যুগোপযোগীকরণ**

**ডিএলআই-৮:** NARS ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মূল্যায়ন

**ডিএলআই-৯:** নির্দিষ্ট কৃষিপণ্যের ভ্যালু চেইন কার্যক্রম জোরদারকরণ

**ডিএলআই-১০:** মানসম্মত তথ্য ব্যবস্থাপনা (কৃষি পরিসংখ্যান এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার গবেষণা)

## পার্টনার ফিল্ড স্কুল (পিএফএস) সম্পর্কে সাধারণ ধারণা

কৃষি সম্প্রসারণ তথ্য ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের একটি উত্তম স্থান হলো পার্টনার ফিল্ড স্কুল (পিএফএস) যেখানে একদল কৃষক-কিষানি মৌসুমব্যাপী নির্দিষ্ট ফসল বা বিষয়ের ওপর উপানুষ্ঠানিকভাবে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা ও কলাকৌশল ব্যবহার করে তাঁরা পরিবেশবান্ধব চাষাবাদের মাধ্যমে পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ ফসলের উৎপাদন বাড়িয়ে লাভবান হতে পারেন, উত্তম কৃষিচর্চার নিয়মনীতি মেনে মানসম্মত ফসল উৎপাদন করে বিপণন ও রপ্তানি করে আয় বাড়াতে পারেন, পারিবারিক পুষ্টি উন্নয়ন করতে পারেন। এ লক্ষ্যে পার্টনার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের ৪৯৫টি উপজেলায় ৩১,৯৯৭টি পিএফএস গঠন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। প্রতিটি পিএফএস-এ ২৫ জন কৃষক-কিষানি অংশগ্রহণ করবেন, যার অন্তত ৩০ শতাংশ হবেন নারী। পার্টনার ফিল্ড স্কুল-ধান এর ১০ দিনের ধারাবাহিক সেশনের মাধ্যমে কৃষকদের হাতেকলমে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ করে গড়ে তোলা হবে, যাতে তাঁরা ধানের অত্যাধুনিক জাত ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন বাড়াতে পারেন, পুষ্টি ও জলবায়ু সহনশীলতা সম্পর্কে ধারণা পান এবং নিজেদের পিএফএস গ্রুপকে একটি ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারে রূপান্তরিত করে টেকসই উন্নয়ন ঘটাতে পারেন।

## পিএফএস-এর নিয়মকানুন

* পিএফএস ধান চাষের মৌসুমে বাস্তবায়িত হবে। মৌসুমব্যাপী সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা করে মোট ১০ দিনে ধাবাবাহিকভাবে কয়েকটি সেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হবে।
* প্রতিটি দিনের প্রশিক্ষণের সময়কাল হবে ৩-৪ ঘণ্টা।
* নির্বাচিত সকল প্রশিক্ষণার্থীকে সময়মতো উপস্থিত থেকে সক্রিয়ভাবে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হবে।
* প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হবে দলগতভাবে ও হাতেকলমে। একজন সহায়তাকারী প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।
* সেরা অংশগ্রহণকারী পুরস্কৃত হবেন।
* প্রতিটি পিএফএস রূপান্তরিত হবে ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারে।

পিএফএস-ধান

# সেশন ০২ প্রাক-মূল্যায়ন (বিবিটি)

**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

ধান চাষে ২৫ জন কৃষকদের বর্তমান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যাচাইয়ের জন্য ১০টি ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে পরীক্ষা বা প্রাক-মূল্যায়ন করতে হবে (বিবিটি)। এসব পরীক্ষার জন্য যথাসম্ভব বেশি জীবন্ত নমুনা ব্যবহার করতে হবে। খেতের পাশে সুবিধাজনক কোনো স্থানে কিছুটা দূরে দূরে সারিবদ্ধভাবে ব্যালট বাক্সগুলো স্থাপন করতে হবে। কৃষকদের সারিবদ্ধভাবে নামের তালিকার ক্রম অনুসারে দাঁড়াতে বলবেন। এরপর নির্দিষ্ট সময় পরপর বাঁশি দিয়ে তাঁদের ব্যালট বাক্সে ভোট তথা সঠিক উত্তর তাঁরা যেটি মনে করেন সেখানে ব্যালট পেপার বাক্সে ফেলতে বলবেন। এই সেশনটি শুরুর আগে সহায়তাকারী ব্যালট বাক্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নিয়ম সম্পর্কে অংশগ্রহণকারী কৃষক-কিষানিদের বলবেন ও একটি মহড়ার মাধ্যমে তাঁদের কীভাবে তা করবেন তা দেখিয়ে দেবেন। পরীক্ষা শেষে ব্যালট বাক্সে পরীক্ষার প্রশ্ন ও ফলাফল পিএফএস রেজিস্টারে লিখবেন। এই পরীক্ষাকে আনন্দময় করতে হবে।

## সেশন সহায়িকা

### ভূমিকা

ব্যালট বাক্স পরীক্ষা একটি মাঠ পরীক্ষা, যা শিক্ষিত বা নিরক্ষর যেই হোক না কেন, সেই প্রশিক্ষণার্থীর জন্য ধারণা ও জ্ঞান সহজে যাচাই করা যায়। এটি মূল্যায়নের একটি উত্তম পদ্ধতি। এ পরীক্ষার বড় বৈশিষ্ট্য হলো সাধারণ বর্ণনা বা নমুনার চিত্র দেখানোর পরিবর্তে বাস্তব নমুনা প্রদর্শন/ব্যবহার করা হয়।

### ব্যালট বাক্স পরীক্ষার জন্য সহায়ক নমুনা প্রশ্ন

নমুনা দিয়ে প্রশ্ন হবে, প্রশ্ন হবে সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত, সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর থাকবে তিনটি। ব্যালট বাক্সের প্রশ্ন করার ক্ষেত্রগুলো হতে পারে মাটি, বীজ, সার, আগাছা, শত্রু পোকা, বন্ধু পোকা, খাদ্য ও পুষ্টি, রোগের ক্ষতির নমুনা, পোকার ক্ষতির নমুনা, বালাইনাশক, সারের অভাবজনিত লক্ষণ, ইঁদুর খাওয়ার লক্ষণ ইত্যাদি। প্রাপ্ত নমুনার ভিত্তিতে প্রশ্ন সাজাতে হবে।

**নমুনা প্রশ্ন**

১। নিচের কোনটি বন্ধু পোকা? (ক) মাকড়সা (খ) মাজরা পোকা (গ) খাটো শুঁড় ঘাস ফড়িং

২। নমুনার কোন সার গাছকে সবুজ করে? (ক) টিএসপি (খ) এমওপি (গ) ইউরিয়া

৩। কোন ধানগাছটি ইঁদুরে কাটার লক্ষণ? (ক) হাতে কাটা (খ) ইঁদুরে কাটা (গ) গরুতে খাওয়া

৪। সুতায় বাঁধা নমুনার কোনটি ধানের মাজরা পোকা নিয়ন্ত্রণে কাজে লাগে? (ক) ধানখেতে ডাল পুঁতা (খ) ধানগাছ (গ) গোবর সার

৫। কোনটি ভালো বীজ? (ক) অপুষ্ট ও চিটা বীজ মিশ্রিত ধানের বীজ (খ) ভালো পুষ্ট বীজ (গ) বাদামি দাগ পড়া বীজ

### পরিচালনার পদ্ধতি

১. উপকারী-অপকারী জীব সংগ্রহ করে শিশিতে সংরক্ষণ করতে হবে। আগাছা নমুনা, আক্রান্ত গাছের চিহ্ন, অভাবজনিত লক্ষণসহ গাছ সংগ্রহ করতে হবে।

২. ১০টি প্রশ্ন তৈরি করতে হবে। নিশ্চিত হতে হবে, ব্যাপক বিষয়, বিশেষ করে মৃত্তিকা, সার, পানি, আগাছা, শস্য, ইঁদুর, উপকারী-অপকারী পোকামাকড় অন্তর্ভুক্ত থাকে।

৩. নিশ্চিত হতে হবে, কিছু প্রশ্ন কার্যক্রম, জীবনচক্র, ক্ষতির লক্ষণ, ব্যবস্থাপনা বিষয়ক হয়।

৪. আর্ট পেপারের টুকরায় স্থানীয় ভাষায় প্রশ্ন লিখতে হবে। আর্ট পেপারের সঙ্গে শিশিসহ নমুনা সংযুক্ত করতে হবে বা রঙিন সুতা দিয়ে মাঠে রাখা নমুনা (গাছ, গাছের অংশ, আগাছা, ক্ষতির লক্ষণ ইত্যাদি) নির্দেশনা দিতে হবে।

৫. প্রত্যেক প্রশ্নের তিনটি সম্ভাব্য উত্তর থাকবে। প্রত্যেক উত্তরের সঙ্গে ছোট বাক্স, যার উপরে খোলা থাকবে এবং অংশগ্রহণকারী

কার্ড (কোড/রোল) ফেলতে পারেন তা তৈরি করতে হবে।

৬. প্রশ্নগুলো বাঁশের খুঁটিতে সংযুক্ত করে মাঠে পুঁতে রাখতে হবে। দুই প্রশ্নের মাঝে ৬ থেকে ৮ মিটার দূরত্ব থাকবে।

৭. প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী ২০টি ছোট কাগজের টুকরো তাদের নামের নম্বরসহ পাবেন। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর (ভোট) তারা এক টুকরো কাগজ সঠিক উত্তর হিসেবে প্রয়োগ করবেন।

৮. শুরু করার আগে ব্যালট বাক্স টেস্ট সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাখ্যা করতে হবে। তাদের প্রশ্ন ও উত্তর উদাহরণ দিয়ে দেখাতে হবে।

৯. প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য ৩০ সেকেন্ড সময় পাওয়া যাবে। সহায়তাকারী ৩০ সেকেন্ড পর বাঁশি বাজাবেন এবং অংশগ্রহণকারীরা পরবর্তী প্রশ্নে অগ্রসর হবেন।

১০. সহায়তাকারী অশিক্ষিত অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে থেকে প্রশ্ন পড়ে দেবেন।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** একইভাবে পিএফএস-এর শেষ দিনে প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন ব্যালট বাক্স পরীক্ষার মাধ্যমে করতে হবে।

পিএফএস-এ কৃষকদের ব্যালট বাক্স পরীক্ষা দেওয়া

# সেশন ০৩ দল গঠন, নামকরণ ও দলনেতা নির্বাচন

**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

সহায়তাকারী অংশগ্রহণমূলকভাবে দল কী ও দল বিভাজনের গুরুত্ব আলোচনা করবেন। কৃষক মাঠ স্কুলে প্রশিক্ষণ ও কাজের সুবিধার্থে তিনি অংশগ্রহণকারী কৃষকদের ৫টি ছোট দলে ভাগ করবেন। পাঁচ রকমের পাতার প্রত্যেক রকমের ৫টি করে মোট ২৫টি পাতা একটি পাত্রে মিশিয়ে রাখবেন। সেখান থেকে উপস্থিত সকলকে একটি করে পাতা নিতে বলবেন। নেওয়া শেষ হলে যাঁরা একটি পাতা পেয়েছে, তাঁদের নিয়ে একটি দল গঠন করবেন ও দলনেতা নির্বাচন করবেন। এভাবে ৫টি দল গঠন করবেন। প্রতিটি দলের একটি নাম দিতে হবে। এরপর দিবস নেতা নির্বাচন করে তাঁর কাজ কী হবে তা বলবেন। দল গঠন ও নামকরণের পর তা পিএফএস রেজিস্টারে লিখে রাখতে হবে।

## সেশন সহায়িকা

### ভূমিকা

এককভাবে অনেক সময় সুষ্ঠুভাবে একটি কাজ করা সম্ভব হয় না। এমন এমন কাজ আছে যেটি এককভাবে করে ভালো ফল পাওয়া যায় না। কোন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সাধারণত একটি বড় দলকে পরিচালনা করা কষ্টকর। তাছাড়া দল বড় হলে দলের প্রত্যেক সদস্যের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় না। কোনো ব্যাবহারিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে তাই প্রশিক্ষণার্থীদেরকে হাতে কলমে ব্যবহারিক কাজ শেখানোর জন্য বা শিক্ষণের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ছোট ছোট দলে বিভক্তির প্রয়োজন হয়।

দল: কোনো অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কাজ করার জন্য সমমনা কিছু লোকের সমষ্টিকে দল বলে।

পিএফএস-এ দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা

১. দল ছোট হলে দলের প্রত্যেক সদস্য হাতেকলমে কাজ করার সুযোগ পায়।
২. সহায়তাকারী প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে থেকে তাকে শেখাতে পারেন বা সহায়তা দিতে পারেন।
৩. দলে কাজ করলে কাজের পরিমাণ বাড়ে ও সময় কম লাগে।
৪. সকলের অংশগ্রহণে সহজে কাজ সম্পন্ন করা যায়।
৫. শক্তি বাড়ে।

### দলের নামকরণ

ধান ফসল ব্যবস্থাপনায় আইপিএম, আইসিএম ও আইপিএনএস বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হবে। তাই এ সম্পর্কিত কোনো কাজ বা বিষয়কে নামকরণের জন্য ব্যবহার করতে হবে। যেমন- মাকড়সা, বোলতা, সবুজ সার, বঙ্গবন্ধু ধান, ফিঙে পাখি ইত্যাদি।

কৃষকদের দল গঠন

## সেশন ০৪ ধানের সম্প্রতি উদ্ভাবিত সাম্প্রতিক জাতসমূহ ব্যবহারের গুরুত্ব, ধান পিএফএস মডিউলের প্রধান প্রধান বিষয় পরিচিতি

**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

সহায়তাকারী ধান পিএফএস-এ কৃষকদের সাথে যেসব বিষয়ে আলোচনা ও মাঠ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে তা পিএফএস পাঠ্যক্রম দেখে সংক্ষেপে আলোচনা করবেন। এ অধিবেশনে সহায়তাকারী কৃষকরা নতুন জাতের (ব্রিধান ১০০ ও তার পরবর্তী জাতসমূহ) কেন চাষ করবেন তা বলবেন ও পাঠ্যক্রমে পিএফএস-এ কী কী বিষয় সম্পর্কে কৃষকরা আর কী কী জানতে চান তা জিজ্ঞেস করবেন ও একটি বড় কাগজে তা লিখবেন।

### সেশন সহায়িকা

**ভূমিকা**

কৃষকরা সবসময়ই চান তাঁর খেতের ফসল ভালো হোক বা ফলন বেশি হোক। কিন্তু শুধু চাইলেই তো আর তা হবে না। সেজন্য অত্যাধুনিক জাত ও প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। বাংলাদেশে শতাধিক জাতের আধুনিক ধান উদ্ভাবিত হয়েছে। পুরোনো জাতগুলো বহুদিন ধরে চাষের ফলে সেসব জাতের মূল বৈশিষ্ট্য অনেকটাই হারিয়ে যায়। সেজন্য ভালো ফলন পেতে হলে কৃষকদের উচিত সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত জাতগুলো ব্যবহার করা। এ দেশে ধানের জাত উদ্ভাবন করে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বা ব্রি এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বা বিনা। ব্রি উদ্ভাবিত ধানের জাতগুলো বিআর বা ব্রিধান নামে পরিচিত, বিনা উদ্ভাবিত জাতগুলো বিনাধান নামে পরিচিত। ব্রি এ পর্যন্ত মোট ১১৫টি জাত উদ্ভাবন করেছে। এগুলোর মধ্যে মাঠে চাষের জন্য পার্টনার ব্রিধান ১০০ (বঙ্গবন্ধু ধান) ও তার পরবর্তী জাতগুলো চাষের পরামর্শ দিচ্ছে। বিনা উদ্ভাবিত জাতের মধ্যে পার্টনার চাষের জন্য বিনাধান ২৫ জাতকে উৎসাহিত করছে।

**সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত জাত ব্যবহারের গুরুত্ব**

১. অধিক পুষ্টিসমৃদ্ধ ও জলবায়ুর অভিঘাত সহনশীল জাত ব্যবহারে পারিবারিক পুষ্টি গ্রহণ বাড়ে ও ধান চাষে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের ঝুঁকি কমে।
২. তুলনামূলকভাবে পুরোনো জাতে রোগ-পোকার আক্রমণ কম হয়।
৩. ফলন বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

**ধান পিএফএস-এর পাঠ্যক্রমে প্রধান প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়**

পার্টনার, ধানের সম্প্রতি উদ্ভাবিত সাম্প্রতিক জাতসমূহ ব্যবহারের গুরুত্ব, ধানের নতুন জাত পরিচিতি, পরিবেশসম্মতভাবে, লাভজনক ও নিরাপদ ধান উৎপাদনের কৌশল, অঙ্কুরোদ্গম পরীক্ষা ধানের বীজতলা তৈরি, বীজ বপন ও চারার পরিচর্যা, ধানের ভালো চারার বৈশিষ্ট্য ও চারা পরিবহণ, এবং চারা রোপণ কৌশল, ধান ফসলে সবুজ সার ও জৈবসারের পরিচিতি, সার ব্যবস্থাপনা ও আইপিএনএস, সেচ সাশ্রয়ী এডব্লিউডি পদ্ধতিতে ধান ফসলের সেচ ব্যবস্থাপনা, ধানের উপকারী ও অপকারী পোকামাকড় সংগ্রহ, বাছাই ও শনাক্তকরণ, আয়েসা, বালাই ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি, জৈব বালাইনাশক, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টার, বীজ সংরক্ষণ, ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টার, সংগঠন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে পার্টনার ফিল্ড স্কুলে কৃষক-কিষানিরা জানতে পারবেন।

# সেশন ০৫ দলীয় গতিময়তা ও জড়তা ভাঙা

**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

এ অধিবেশনে সহায়তাকারী দলীয় গতিময়তা তালিকা থেকে একটি দলীয় গতিময়তা/জড়তা ভাঙার খেলা নির্বাচন করে তা কৃষক-কিষানিদের দিয়ে করাবেন ও তা থেকে তাঁরা কী শিক্ষা পেলেন তা বুঝিয়ে বলবেন। শেষে তাঁদের প্রশ্ন করবেন, দলকে গতিময় করতে এ শিক্ষা কোনো ভূমিকা রাখবে কি না?

## সেশন সহায়িকা

### ভূমিকা

প্রশিক্ষণার্থীরা যখন একই কাজ করতে করতে একঘেয়েমিতে ভুগতে থাকেন বা কাজের একাগ্রতা হারিয়ে ফেলেন, তখন তাদের মাঝে কাজের আগ্রহ ফিরিয়ে আনা খুবই জরুরি হয়ে পড়ে। প্রশিক্ষণার্থীদের কাজের আগ্রহ ফিরিয়ে আনা এবং তাঁদের মধ্যে দলীয়ভাবে কাজ করার স্পৃহা তৈরি করার লক্ষ্যে পিএফএস-এ যে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তাকে দলীয় গতিময়তা বা জড়তা ভাঙা বলা হয়ে থাকে। পিএফএস-এর প্রতিদিনের কর্মসূচিতে এ ধরনের অন্তত একটি কার্যক্রম থাকা উচিত।

### দলীয় গতিময়তা

পার্টনার ফিল্ড স্কুলে প্রশিক্ষণার্থীদের কাজের আগ্রহ ফিরিয়ে আনা এবং তাঁদের মধ্যে দলীয়ভাবে কাজ করার স্পৃহা তৈরি করার লক্ষ্যে এফএফএস-এ যে সকল আনন্দদায়ক ও শিক্ষণীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, তাকে বলে দলীয় গতিময়তা। দলীয় গতিময়তার মধ্যে অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় থাকতে হবে, যাতে করে প্রশিক্ষণার্থীরা দলীয়ভাবে কাজ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। দলীয় গতিময়তা পরিচালনার আগে অবশ্যই কিছু নীতিমালা বা নিয়ম গ্রহণ করতে হয়, যা দলীয় গতিময়তা চলাকালে দলের সবাই মেনে চলবেন। লক্ষ রাখতে হবে কার্যক্রমটিতে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথে সবার কাছে তা যেন আকর্ষণীয় হয়। যেমন- রাবার ব্যান্ড পাসিং, ফিসফিসানি খেলা (তথ্য বিনিময়), যত পারো বস্তুর নাম লিখো ইত্যাদি।

### জড়তা ভাঙা

পার্টনার ফিল্ড স্কুলের প্রশিক্ষণার্থীরা দিবসের বাঁধাধরা কর্মসূচি অনুযায়ী সাধারণত: কাজ করে অভ্যস্ত নন, যার কারণে মাঝে মাঝে তাঁরা চলমান পিএফএস সেশনের প্রতি মনোযোগ বা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায় কার্যকরভাবে সেশন পরিচালনা করা যায় না। সেশনের প্রতি তখন সবার আগ্রহ ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক (স্বল্প সময়ের জন্য) আনন্দদায়ক বা বিনোদনমূলক কিছু যেমন- কৌতুক, গান, বিভিন্ন ধরনের শারীরিক কসরত ইত্যাদি করে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে চাঙ্গা করে তোলাই হলো জড়তা ভাঙা।

### দলীয় গতিময়তা ও জড়তা ভাঙার মধ্যে পার্থক্য

| দলীয় গতিময়তা | জড়তা ভাঙা |
|---|---|
| পিএফএস-এ প্রশিক্ষণার্থীদের কাজের আগ্রহ ফিরিয়ে আনা এবং তাঁদের মধ্যে দলীয়ভাবে কাজ করার স্পৃহা তৈরি করার লক্ষ্যে পিএফএস-এ যে সকল আনন্দদায়ক ও শিক্ষণীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তা দলীয় গতিময়তা | পিএফএস-এর কৃষকদের কাজের একঘেয়েমি কাটিয়ে তাঁদের কাজের মনোযোগ এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য তাৎক্ষণিক আনন্দদায়ক কিছু করা হলে জড়তা ভাঙা |
| দলীয় গতিময়তা পরিচালনার পূর্বে অবশ্যই কিছু নীতিমালা ঠিক করতে হয়, যা দলের সবাই দলীয় গতিময়তা চলাকালে মেনে চলে | জড়তা ভাঙার জন্য বিশেষ কোনো নীতিমালা ঠিক করার প্রয়োজন নেই |
| আনন্দের পাশাপাশি অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় থাকতে হবে, যা থেকে কৃষকরা দলের সাথে কাজ করতে অনুপ্রাণিত হবে | আনন্দদায়ক হবে, শিক্ষণীয় বিষয় থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে |
| সাধারণত দলের প্রায় সকলের অংশগ্রহণ থাকে | সকলের অংশগ্রহণ নাও থাকতে পারে |

# সেশন ০৬ ধানের নতুন জাত পরিচিতি ও নতুন জাতের বীজ উৎপাদন ব্যবসায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি

**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

এ অধিবেশনে সহায়তাকারী কৃষকরা নতুন জাতের (ব্রিধান ১০০ ও তার পরবর্তী জাতসমূহ) কেন চাষ করবেন, কোন জাত কোন মৌসুমে চাষ করবেন, সেসব জাতের বৈশিষ্ট্য কি, বীজ পাবেন কী করে, উৎপাদিত বীজের ব্যবসা কী করে করা যাবে ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করবেন। শেষে কৃষকদের কাছ থেকে জানবেন, তাঁরা কে কে ধানের নতুন জাতের বীজ উৎপাদন ও ব্যবসা করবেন।

## সেশন সহায়িকা

### ভূমিকা

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বা ব্রি এ পর্যন্ত ধানের উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে ১১৫টি। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বা বিনা উদ্ভাবন করেছে ২৫টি ধানের জাত। এসব জাতের মধ্যে সর্বাধুনিক জাতটি চাষের জন্য বেছে নেওয়া উচিত (তালিকা ১)। পিএফএস-এ সে জাতের চাষ করে যদি তার অবস্থা ভালো দেখা যায়, তাহলে পড়শি অনেক কৃষক সে জাতের ধান চাষে আগ্রহী হতে পারেন। সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত নতুন জাতের বীজের সহজলভ্যতা যেহেতু এলাকায় বা বাজারে কম থাকে, তাই পিএফএস কৃষকদের মধ্যে থেকে যে কেউ সে জাতের বীজ উৎপাদন করে বীজ ব্যবসা করে লাভবান হতে পারেন। এতে এলাকার মধ্যে নতুন জাতের বীজ সম্প্রসারণের সুযোগও তৈরি হয়।

**তালিকা ১. ধানের সাম্প্রতিক জাতগুলোর বৈশিষ্ট্য**

| জাতের নাম | বৈশিষ্ট্য | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | চাষের মৌসুম | জীবনকাল (দিন) | উচ্চতা (সেন্টিমিটার) | ফলন (টন/হেক্টর) | বিশেষ বৈশিষ্ট্য |
| ব্রিধান ১০০ (বঙ্গবন্ধু ধান) | বোরো | ১৪৮ | ১০১ | ৭.৭ | নাইজারশাইল ও জিরা ধানের মতো চাউল, চাউলে জিংকের পরিমাণ ২৫.৭ মিগ্রা/ কেজি, প্রোটিন ৭.৮% |
| ব্রিধান ১০১ | বোরো | ১৩৫-১৫২ | ১১০ | ৭.৭২ | প্রোটিনসমৃদ্ধ চাউল, চাউলে প্রোটিনের পরিমাণ ৯.৮%, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগ প্রতিরোধী |
| ব্রিধান ১০২ | বোরো | ১৫০ | ১০৩ | ৮.১ | জিংকসমৃদ্ধ, চাউলে জিংকের পরিমাণ ২৫.৫ মিগ্রা/কেজি, অ্যামাইলোজ ২৮% ও প্রোটিন ৭.৫%। |
| ব্রিধান ১০৩ | আমন | ১২৮-১৩৩ | ১২৫ | ৬.২ | চাউলে অ্যামাইলোজ কম (২৪%), চাউল চিকন ও লম্বা, রপ্তানিযোগ্য |
| ব্রিধান ১০৪ | বোরো | ১৪৭ | ৯২ | ৭.৩ | চাউলে প্রোটিনের পরিমাণ ৮.৯%, সুগন্ধি চাউল, বাসমতি চাউলের মতো সাদা, চিকন ও লম্বা |
| ব্রিধান ১০৫ | বোরো | ১৪৮ | ১০১ | ৭.৬ | চাউলে প্রোটিনের পরিমাণ ৭.৩%, লো জি আই রাইস বা ডায়াবেটিক রাইস |
| ব্রিধান ১০৬ | আউশ | ১১৭ | ১২৫ | ৪.০৮ | অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে চাষের উপযুক্ত। প্রোটিনসমৃদ্ধ (প্রোটিন ৮.৫%) |
| ব্রিধান ১০৭ | বোরো | ১৪৩ | ১০৩ | ৮.১৯ | উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ জাত, চাউলে প্রোটিনের পরিমাণ ১০.০২% |
| ব্রিধান ১০৮ | বোরো | ১৪৯-১৫১ | ১০২ | ৯.৫৭ | হেলে পড়া প্রতিরোধী, চাউলে অ্যামাইলোজ ২৪.৫% ও প্রোটিন ৮.৮% |
| বিনাধান ২৫ | বোরো | ১৩৮-১৪৮ | ১১৬ | ৭.৬ | প্রিমিয়াম কোয়ালিটি রাইস, রপ্তানিযোগ্য, চাউলে প্রোটিনের পরিমাণ ৬.৬%, মাজরা পোকার আক্রমণ মধ্যম প্রতিরোধী |

### জাত নির্বাচন

জাত নির্বাচনের ভিত্তি হলো সে জাতের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য। পার্টনার সেসব জাত নির্বাচনে কৃষকদের উৎসাহিত করে যেসব/যে জাত অধিক পুষ্টিসমৃদ্ধ ও জলবায়ুর অভিঘাত সহনশীল এবং বাণিজ্যিক সম্ভাবনা আছে।

### বীজপ্রাপ্তির উৎস

বীজ উৎপাদনের জন্য ভালো হবে নির্বাচিত জাতের ভিত্তি বীজ বা ফাউন্ডেশন সীড জোগাড় করা। ব্রি, বিনা ও বিএডিসি এসব বীজের উৎসস্থল।

### বীজ উৎপাদন ও ব্যবসা

নির্বাচিত জাতের ধানের বীজ উৎপাদন করতে চাইলে বীজ উৎপাদনের ধারাবাহিক ধাপগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। সাধারণত প্রতি হেক্টরে চাষের জন্য ২৫ থেকে ৩০ কেজি বা এক একর জমির জন্য ১০-১২ কেজি এবং বিঘাপ্রতি ৩-৪ কেজি বীজ দরকার হয়। বীজ উৎপাদনের ধারাবাহিক ধাপগুলো হলো- জাত নির্বাচন, জমি চাষ, বীজ শোধন, সঠিক বয়সের চারা রোপণ, সঠিকভাবে সঠিক সময়ে সঠিক দূরত্বে চারা রোপণ, সার ও সেচ প্রয়োগ, আগাছা পরিষ্কার, বিজাত বাছাই, বালাই ব্যবস্থাপনা, উপযুক্ত সময়ে ধান কাটা ও বীজ সংগ্রহ, মজুত, প্যাকিং ও বীজ হিসেবে বিপণন।

# সেশন ০৭ পরিবেশসম্মতভাবে, লাভজনক ও নিরাপদ ধান উৎপাদনের কৌশল

**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সহায়তাকারী কৃষকদের নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য ধান চাষের পরিবেশসম্মত কৌশলগুলো কী কী হতে পারে, কীভাবে তা করা যায়, সে সম্পর্কে ধারণা দেবেন (জৈবসার ও সবুজ সার ব্যবহার, ন্যূনতম ইউরিয়া সার ব্যবহার করা বা না করা, এডব্লিউডি পদ্ধতিতে সেচ, খড় না পোড়ানো ইত্যাদি)। এসব প্রযুক্তিসমূহ অনুশীলনের জন্য সদস্যদের মধ্য থেকে আগ্রহী একজন কৃষকের জমিতে ধানের আইসিএম পরীক্ষণ প্লট স্থাপন করে সেখানে এসব প্রযুক্তির প্রয়োগ বা চর্চা করাতে হবে।

## সেশন সহায়িকা

### ভূমিকা

ধান চাষে বর্তমানে কৃষকরা যেসব কাজ করছে, তাতে ধানের ফলন বাড়লেও পরিবেশ দূষণ বাড়ছে। বিশেষ করে ইউরিয়া সার ব্যবহারে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস নির্গত হচ্ছে, ধানখেতে সবসময় সেচে পানি ধরে রাখার জন্য সেখান থেকে বায়ুমণ্ডলে মিথেন গ্যাস নিঃসরণ ঘটছে, রাসায়নিক বালাইনাশক প্রয়োগের ফলে বায়ু দূষণ ও খাদ্য দূষণ হচ্ছে, ধান কাটার পর জমির খড় অনেক সময় আগুন দিয়ে পোড়ানোর ফলে সেখান থেকে কার্বন ডাই- অক্সাইড গ্যাস নিঃসরণ হচ্ছে। নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, কার্বন ডাই- অক্সাইড– এ সবই গ্রীনহাউজ গ্যাস। এর বৃদ্ধিতে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়ছে। এতে পরিবেশের ও মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে। তাই ধান চাষে যাতে পরিবেশের কোনো ক্ষতি না হয়, সেজন্য কৃষকদের এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে ও পরিবেশসম্মত উপায়ে ধান চাষের কৌশলগুলো শেখাতে হবে।

### ধান চাষের পরিবেশসম্মত কৌশল

#### (১) জৈবসার ও সবুজ সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করা এবং আইপিএনএস অনুসরণ করা

পরীক্ষায় বারবার দেখা গেছে, শুধু রাসায়নিক সার নয়, এর সাথে হিসাব করে জৈবসার দিতে পারলে ধানের ফলন শুধু সার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অন্তত ১৫ শতাংশ বাড়ানো সম্ভব। তাই চাষিদের জানতে হবে, কোন মৌসুমে কীরূপ জমিতে কী কী সার কতটুকু দিতে হবে। মনে রাখা দরকার যে, এখন শুধু ইউরিয়া বা সাদা সার দিয়ে ধান চাষ করার দিন শেষ হয়ে গেছে। মাটির স্বাস্থ্য ও পরিবেশ ঠিক রেখে ভালো ফলন পাওয়ার জন্য জমিতে সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগের কোনো বিকল্প নেই। ধানগাছ মাটি থেকে তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি বা খাদ্য উপাদান সংগ্রহ করে থাকে। একই জমিতে বছরের পর বছর নিবিড় ধান চাষের ফলে মাটির খাদ্যভান্ডারে ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান বা খাদ্যের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে প্রতি টন ধান উৎপাদনের জন্য গাছ মাটি থেকে প্রায় ১৮ কেজি নাইট্রোজেন, ৪ কেজি ফসফরাস, ২২.৫ কেজি পটাশিয়াম এবং ৩৫ কেজি সালফার বা গন্ধক নিয়ে থাকে। বাংলাদেশে যে পরিমাণ ধান বছরে উৎপাদিত হয়, তাতে প্রতিবছর মাটি থেকে প্রায় ১০ লক্ষ টন বিভিন্ন খাদ্য উপাদান অপসারিত হচ্ছে। তাই জমির এই হারানো উর্বরতা ফিরিয়ে ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে বর্ধিত খাদ্য উৎপাদনের জন্য জৈব ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা (আইপিএনএস) অনুসরণ করা জরুরি। জৈবসার মাটির উর্বরতা ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশ এর পরিস্থিতিতে উত্তম মাটিতে কমপক্ষে শতকরা ২ ভাগ জৈব পদার্থ থাকা উচিত। কিন্তু মাটি পরীক্ষার ফলাফলে অধিকাংশ মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ শতকরা ১.৫ ভাগেরও কম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শতকরা ১ ভাগেরও কম। ফসল উৎপাদনের জন্য মাটির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণই হলো জৈব পদার্থের প্রয়োজন অনুপাতে ঘাটতি।

ধানের জমিতে সার দেওয়ার জন্য দুভাবে সারের মাত্রা নির্ধারণ করা যেতে পারে। একটি হলো যে জমিতে ফসল উৎপাদন করা হবে, সরাসরি সেই জমির মাটি পরীক্ষা করে এবং অন্যটি হলো কৃষি পরিবেশ অঞ্চলভিত্তিক মাটির উর্বরতা শ্রেণিভিত্তিক সার সুপারিশমালা অনুসরণ করে।

অসম বা অতিরিক্ত সার ব্যবহারের ফলে ধানের ফলন কমে যায়, পক্ষান্তরে পরিবেশ দূষণ, মাটির স্বাস্থ্যহানি ও খাদ্যে নিরাপত্তার ঝুঁকি বাড়ে। এজন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ধান চাষে সুষম সার ব্যবহারের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। বাংলাদেশের সবকয়টি

কৃষি-পরিবেশ অঞ্চলে ব্যবহারের উপযোগী, জীবনকাল, স্থান ও মৌসুমের ওপর ভিত্তি করে ধান চাষে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উফশী ধান চাষে নিম্নলিখিত পরিমাণে সুষম সার ব্যবহারের সুপারিশ করেছে (তালিকা ২)-

**তালিকা ২. মৌসুম অনুযায়ী উফশী জাতের ধানে সুষম সারের মাত্রা**

| মৌসুম | জীবনকাল (দিন) | ইউরিয়া-টিএসপি/ডিএপি-এমওপি-জিপসাম-দস্তা সার (কেজি/বিঘা) |
|---|---|---|
| আউশ | ১০০-১১৫ | ১৮-৭-১১-০-০ |
| আমন | ১৪৫ | ২৬-৮-১৪-৯-০ |
| আমন | ১৩৫-১৪৫ | ২২-৮-১৪-৯-০ |
| আমন | ১২৫ | ২০-৭-১১-৮-০ |
| আমন (সুগন্ধি জাত) | ১৩০ | ১২-৭-৮-৯-০ |
| আমন (আলোক সংবেদনশীল) | - | ২৩-৯-১৩-৮-০ |
| বোরো | ১৫০ | ৪০-১৩-২২-১৫-১.৫ |
| বোরো | ১৫০ | ৩৫-১২-২০-১৫-১.৫ |
| হাওড় অঞ্চলের জাত | - | ২৭-১২-২২-৮-১.৫ |

### (২) ইউরিয়া সারের ব্যবহার হ্রাস বা বন্ধ করা

ইউরিয়া সার ধানগাছের বৃদ্ধি ঘটায় সত্য, তবে এ সার প্রয়োগে ধানগাছের বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ ও বালাইয়ের আক্রমণ বৃদ্ধি করে। তাই যতটা পারা যায় ধান চাষে ইউরিয়া সারের ব্যবহার কমাতে হবে, সম্ভব হলে এর প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। তবে এ কারণে যেন ফলন কমে না যায় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। এজন্য কিছু কৌশল বা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, যেমন-

- বোরো ধান কাটার পর ও আমন ধানের চারা লাগানোর পূর্বে ও মধ্যবর্তী সময়ে সবুজ সার হিসেবে জমিতে ধৈঞ্চার চাষ করতে হবে। এতে আমন ফসলে ইউরিয়া সারের ব্যবহার প্রায় ৪০ শতাংশ কমানো যায়।
- সব মৌসুমেই পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈবসার প্রয়োগ করতে হবে। সম্ভব হলে তা জমি তৈরির সময় প্রথম চাষেই জমিতে সমভাবে জৈবসার মিশিয়ে দিতে হবে। প্রতি হেক্টরে ৫ টন জৈবসার ব্যবহার করলে ইউরিয়া সারের পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ কম লাগবে।
- গুটি ইউরিয়া থেকে ইউরিয়ার অপচয় খুব কম হয়। এ কারণে গুটি ইউরিয়া ব্যবহারে নাইট্রোজেন সারের কার্যকরিতা শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ বেড়ে যায়। যার ফলে ইউরিয়া সার পরিমাণে কম লাগে। গুটি ইউরিয়া সার জমিতে গুড়া ইউরিয়া সারের মতো ২ থেকে ৩ কিস্তিতে ব্যবহার করতে হয় না, একবার ব্যবহার করলেই চলে।

### (৩) পর্যায়ক্রমে ভিজানো ও শুকানো পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া

ধানের জমিতে সবসময় পানি আটকে না রেখে পর্যায়ক্রমে ভিজানো ও শুকানো (এডব্লিউডি) পদ্ধতিতে সেচ দিতে হবে। ধানের জমিতে সবসময় দাঁড়ানো পানি রাখার প্রয়োজন নেই। তবে লক্ষ রাখতে হবে, ধান গাছ যেন খরা কবলিত না হয়। একবার ভালো করে সেচ দেওয়ার পর পরের সেচ দেওয়ার আগে জমি তিন দিন শুকনো রাখতে পারলে ধানের ফলন তেমন না কমলেও পানির পরিমাণ শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ কম লাগে যা কি না ধানের উৎপাদন খরচকে অনেক কমিয়ে আনে। এডব্লিউডি পদ্ধতিতে সেচ দিলে বোরো ধানের জমিতে শতকরা প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ ভাগ সেচ কম লাগে।

### (৪) রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা

রাসায়নিক বালাইনাশক প্রয়োগে পরিবেশ, প্রাণী ও মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে। তাই সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করে ধানের জমিতে রাসায়নিক বালাইনাশকের ব্যবহার বন্ধ বা কমাতে হবে। এজন্য কিছু কাজ ধারাবাহিকভাবে করে যেতে হবে, যেমন- ভালো বীজ ব্যবহার, বীজ শোধন, বালাইমুক্ত চারা রোপণ করা, সারিতে লোগো পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে চারা রোপণ করা, খেতে কঞ্চি বা ডাল পুঁতা, আলোক ফাঁদ ব্যবহার, নিকাশ ব্যবস্থা ভালো রাখা, অতিরিক্ত ইউরিয়া সার প্রয়োগ না করা, আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে বা তুলে ধ্বংস করা, হাতজাল দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলা, অযথা বালাইনাশক প্রয়োগ না করা, প্রয়োজনে জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করা ইত্যাদি।

### (৫) জমিতে নাড়া বা খড় না পোড়ানো

ধানগাছের গোড়া থেকে তিনভাগের একভাগ রেখে ধান কাটতে হবে। ধান কাটার পর জমিতে যে খড় বা নাড়া পড়ে থাকে তা একবার চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে, পোড়ানো যাবে না। এতে ধানের জমিতে পুষ্টির পুনর্ভরণ হবে ও পরের মৌসুমে রাসায়নিক সারের পরিমাণ কম লাগবে। পুড়িয়ে ফেললে কিছু পটাশ হয়তো যোগ হবে, কিন্তু খড় পোড়ানো ধোঁয়ায় পরিবেশ দূষিত হবে ও বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণ বেড়ে যাবে। তাছাড়া খড়ের ভেতরে ক্যারাবিড বিটিল, মাকড়সা, স্ট্যাফাইলিনিড বিটিল ইত্যাদি অনেক পোকারা ধান কাটার পর আশ্রয় নেয়। পোড়ানোয় এসব বন্ধু পোকারা মারা যায়।

# সেশন ০৮ কৃষকদের নিয়ে অংশগ্রহণমূলক শিখন প্লটের রূপায়ণ ও শিখন প্লট স্থাপন

**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সহায়তাকারী কৃষকদের দ্বারা পরিবেশবান্ধব ধান চাষ প্লট স্থাপন (নতুন জাত ব্যবহার, এডব্লিউডি পদ্ধতিতে সেচ, জৈবসার ও সবুজ সার ব্যবহার, ইউরিয়া সার ব্যবহার হ্রাস/ বন্ধ, পার্চিং, আলোক ফাঁদ, জৈব বালাইনাশক ব্যবহার, খড় না পোড়ানো ইত্যাদি চর্চা)। একটি পিএফএস-এর একজন আগ্রহী কৃষকের মাঠে কমপক্ষে ২০ শতক জমিতে এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবেশসম্মত ধান চাষের একটি প্রদর্শনী/আইসিএম পরীক্ষণ প্লট এবং জাত পরীক্ষার প্লট স্থাপন করবেন। নিয়মিতভাবে পিএফএস কৃষকরা সে প্লট পর্যবেক্ষণ করবেন ও শেষে ফলাফল বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

## সেশন সহায়িকা

### ভূমিকা

পার্টনার ফিল্ড স্কুলের প্রাণ হলো এর বিভিন্ন মাঠ পরীক্ষণ বা ট্রায়াল প্লট। ট্রায়াল বা পরীক্ষণ কৃষকদের মনে যতটা আস্থা ও বিশ্বাস তৈরি করতে পারে অন্য কোনো পদ্ধতির প্রশিক্ষণই তা পারে না। মাঠ পরীক্ষা ছাড়া পিএফএস-এর শিখন সফলভাবে সম্পন্ন হয় না। তাই সময়মতো এই ট্রায়াল প্লটসমূহ স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। পিএফএস-এ ধানের সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা (আইসিএম) ও জাত পরীক্ষা দুটি স্থাপন করা দরকার। এর মাধ্যমে কৃষকদের হাতেকলমে পরিবেশসম্মত উপায়ে ফসল ব্যবস্থাপনার কলাকৌশলগুলো শেখানো যায়। পাশাপাশি সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত ধানের নতুন জাতগুলোকে পরিচিত করানো বা সম্প্রসারণ ঘটানো যায়।

ধানের আইসিএম প্লট বনাম কৃষক প্লট স্থাপন

### উদ্দেশ্য

* আইসিএম প্রযুক্তির সাথে কৃষক ব্যবস্থাপনার তুলনা করা
* আয় ব্যয়ের তুলনা করা
* ফসল ব্যবস্থাপনার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অনুশীলন করা
* হাতেকলমে করে ও দেখে আইসিএম প্রযুক্তির ওপর আত্মবিশ্বাস জন্মানো

### প্লটের নকশা

| আইসিএম প্লট<br>২০ শতক | কৃষক প্লট<br>২০ শতক |
|---|---|

### অনুসরণীয় বিষয়াবলি

* পিএফএস-এ ২৫ জন কৃষক-কিষানির মধ্য থেকে ১ জন কৃষক বেছে নিতে হবে যিনি প্রগতিশীল, আগ্রহী ও প্রকৃত চাষি, নিজে চাষে বিনিয়োগ করতে সম্মত।
* তাঁর জমিতেই ধানের আইসিএম প্লটের জন্য কমপক্ষে ২০ শতক জমি নিতে হবে।
* ধানের আইসিএম প্লটে চাষের জন্য জাত হিসেবে বেছে নিতে হবে ব্রিধান ১০০ বা তার পরের জাতগুলো। বিনাধান ২৫ জাতটিও নেওয়া যেতে পারে। যে মৌসুমের জন্য যে জাত, সে মৌসুমের জন্য সে জাতই ব্যবহার করতে হবে। কৃষক প্লটের কৃষক যে জাত চাষ করেন সে জাতকে চাষ করতে দিতে হবে।
* অবশ্যই বিশ্বস্ত সূত্র থেকে ভালো মানের বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

* আইসিএম প্লটের জন্য নির্বাচিত কৃষকের জমিতেই আদর্শ বীজতলা তৈরি করতে হবে এবং উৎপাদিত চারা আইসিএম প্লটে রোপণ করতে হবে। বীজতলা তৈরি করে চারা উৎপাদন সম্ভব না হলে বিশ্বস্ত কোনো স্থান থেকে নির্বাচিত জাতের ভালো চারা সংগ্রহ করে রোপণ করতে হবে।
* আইসিএম প্লটে আইসিএম-এর সব কলাকৌশল সমন্বিতভাবে প্রয়োগ করতে হবে। যেমন- নির্দিষ্ট বয়সের চারা রোপণ করা, সারিতে চারা রোপণ করা, প্রতি গোছায় ২টি চারা রোপণ করা, পার্চিং/লাইভ পার্চিং হিসেবে জমিতে দৈঞ্চা রোপণ করা, বালাই ব্যবস্থাপনার জন্য সমন্বিত কার্যক্রম সময়মত গ্রহণ করা, ক্ষতিকর পোকা মনিটরিং বা ব্যবস্থাপনার জন্য আলোর ফাঁদ ব্যবহার করা, পর্যায়ক্রমিক ভিজানো ও শুকানো (অডউ) পদ্ধতিতে পানি ব্যবস্থাপনা (যেখানে প্রযোজ্য), আইলে আইল ফসল করা (সাফল্য লাভের জন্য পলিব্যাগে পূর্বেই চারা তৈরি করে নিন), জৈব ও উদ্ভিজ্জ বালাইনাশক প্রয়োগ করা ইত্যাদি।
* আইসিএম প্লটে ব্যবস্থাপনার সকল সিদ্ধান্ত সে খেতের কৃষি পরিবেশ বিশ্লেষণ বা আয়েসার ভিত্তিতে গ্রহণ করা।
* আইপিএনএস (ওচঘঝ) অনুসরণ করে জৈব ও অজৈব সারের সমন্বয়ে সমন্বিত সার ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা।
* আইসিএম প্লটের আইল সুগঠিত হতে হবে, যাতে করে সার বৃষ্টি বা সেচের পানির সাথে অন্য প্লটে চলে না যায় এবং অন্য খেত থেকে রোগজীবাণু পানিবাহিত হয়ে খেতে প্রবেশ না করে।
* আইসিএম প্লটটি বীজ প্লট হিসেবে ব্যবহার করতে হবে এবং আবশ্যই রগিং বা বিজাত বাছাই করতে হবে।
* পরীক্ষণ প্লট সাইনবোর্ড দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে।
* পিএফএস রেজিস্টারে আইসিএম প্লটের সকল তথ্য লিখতে বা রাখতে হবে।

**ধানের জাত পরীক্ষা প্লট স্থাপন**

**উদ্দেশ্য**

* সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত ধানের জাতগুলো কৃষকদের সাথে পরিচিতি করানো।
* এসব জাতের সাথে কৃষকদের প্রচলিত জাতের তুলনা করা
* প্রতিটি জাতের ফলন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করা ও এর ভিত্তিতে কৃষকদের কাছে জাতের গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরা।
* হাতেকলমে করে ও দেখে নির্দিষ্ট জাতের ওপর কৃষকদের আত্মবিশ্বাস জন্মানো।

**প্লটের নকশা**

| | | | |
|---|---|---|---|
| জাত ১<br>২ মি. x ২ মি. | জাত ১<br>২ মি. x ২ মি. | জাত ১<br>২ মি. x ২ মি. | জাত ১<br>২ মি. x ২ মি. |

অনুসরণীয় বিষয়াবলি

* একটি পিএফএস-এ ৪টি জাতের সমন্বয়ে জাত পরীক্ষা প্লট স্থাপন করতে হবে। একটি হবে কৃষকের জাত, অন্য ৩টি হবে পার্টনার কর্তৃক সুপারিশকৃত জাত (ব্রিধান ১০০ ও তার পরবর্তী)।
* প্রতিটি পরীক্ষা প্লটের আয়তন হবে ২ মিটার ী ২ মিটার বা ৪ বর্গমিটার।
* প্রতিটি জাতের প্লট পৃথকভাবে আইল দ্বারা ঘেরা ও জাতের নাম লেখা সাইনবোর্ড দ্বারা চিহ্নিত থাকবে।
* সব জাতের প্লটে ব্যবস্থাপনা সমানভাবে করতে হবে।
* এক সেশন পরপর কৃষকদের নিয়ে একবার জাতগুলোর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করাতে হবে, ফলন নিতে হবে ও তথ্য রেজিস্টারে লিখতে হবে। চূড়ান্তভাবে জাতগুলো সম্পর্কে কৃষকদের মতামত বা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

# সেশন ০৯ অঙ্কুরোদ্‌গম পরীক্ষা স্থাপন ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

সহায়তাকারী প্রথমে অঙ্কুরোদ্‌গম পরীক্ষা কী ও কেন করা দরকার তা বলবেন। অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ও ব্যাবহারিক কাজের মাধ্যমে কৃষকরা যাতে বীজ বোনার আগে সেসব বীজের গজানোর হার ও বীজটা ভালো না মন্দ তা বুঝতে পারেন, সেভাবে হাতেকলমে অঙ্কুরোদ্‌গম পরীক্ষা করাবেন। এ পরীক্ষার দ্বারা কৃষকরা যাতে বীজ গজানোর হার নির্ণয় বা হিসাব করতে পারেন, বীজের প্রকৃত হার ঠিক করতে পারেন, সেসব বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে সহায়তাকারী কৃষক-কিষাণীদের সাহায্য করবেন। পরীক্ষা হবে দলগত। এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সাথে রাখবেন।

## সেশন সহায়িকা

**বীজ গজানোর সহজ পরীক্ষা বা অংকুরোদ্‌গম পরীক্ষা**

উপযুক্ত পরিবেশে বীজের ভ্রূণ থেকে অঙ্কুর বের হয়ে সুস্থ-সবল চারা গজানো হলো বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম। বীজ আসলে গজায় কি না, বা গজালে কী পরিমাণ গজায়, তা যাচাই করা হলো অঙ্কুরোদ্‌গম পরীক্ষা।

**অঙ্কুরোদ্‌গম পরীক্ষার উদ্দেশ্য**

* ব্যবহারের পূর্বে বীজ গজানোর পরীক্ষা করা হলে বীজ ভাল আছে নাকি বীজ হিসেবে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে গেছে তা সহজেই জানা যায়। বীজ পরীক্ষা করে আগেভাগেই ফলাফল জানা গেলে খারাপ বীজের লোকসান থেকেও বাঁচা যায়।
* বীজের মুখ ফাটলেই বা অঙ্কুর বের হলেই যে বীজ ভালো আছে – এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ অঙ্কুর বের হওয়ার পরও খারাপ বীজের কারণে অনেক চারা মারা যেতে দেখা যায়। সে কারণে বীজ থেকে চারা গজানোর পর সম্পূর্ণ চারাটি পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

**এ পরীক্ষার জন্য করণীয়**

* ভেজা বালিভর্তি মাটির থালায় বা প্লাস্টিক পাত্রে ১০০টি ধানের বীজ বসিয়ে হালকা করে বালি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বালি যেন শুকিয়ে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বালিতে গজানোর কারণে পরীক্ষার সময় চারা উঠালে শিকড় ছিঁড়ে যাবে না- ফলে শিকড়সহ সম্পূর্ণ চারাটি পরীক্ষা করা সম্ভব হবে।
* মৌসুমভেদে বীজ বপনের ৭ থেকে ১০ দিন পর গজানো চারা বালি থেকে তুলে একটা একটা করে পরীক্ষা করে অপেক্ষাকৃত ছোটবড় ও রোগাক্রান্ত চারা, দুর্বল শিকড়সহ চারা, মৃত-পচা বীজ, অগজানো শক্ত বীজ ইত্যাদি বাদ দিয়ে যদি কমপক্ষে ৮০টি চারা সুস্থ-সবল পাওয়া যায়- তাহলে বুঝতে হবে বীজ ভাল আছে।
* ভেজা চটে, লম্বালম্বিভাবে দুই ভাগ করা কলা বা কচুর খোলের কোঠরে, পুরানো কাপড়/ডাস্টার ক্লথে ১০০টি বীজ বসিয়েও গজানোর পরীক্ষা করা যেতে পারে। তবে এসব পদ্ধতিতে চারা পরীক্ষা করা কিছুটা অসুবিধাজনক। তাই সহায়তাকারী পিএফএস-এর কৃষকদের দিয়ে মাটির সানকি বা পাত্রে এ পরীক্ষা করাবেন।

**গজানোর হার বের করার সূত্র :**

$$\text{বীজ গজানোর শতকরা হার} = \frac{\text{গজানো বীজের সংখ্যা} \times ১০০}{\text{বসানো বীজের সংখ্যা}}$$

# সেশন ১০ ধানের আদর্শ বীজতলা তৈরি, বীজ বপন ও চারার পরিচর্যা

**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

সহায়তাকারী ধানের আদর্শ বীজতলা তৈরির গুরুত্ব ও পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করবেন। আদর্শ বীজতলা করা বা না করার তাঁদের যদি কোনো অভিজ্ঞতা থাকে, তবে তা সবার সাথে বিনিময় করাবেন। সম্ভব হলে কৃষকদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে দিয়ে তাঁদের জমিতে সে মৌসুমে আদর্শ বীজতলা করতে উৎসাহিত ও বাস্তবায়িত করবেন।

## সেশন সহায়িকা

### আদর্শ বীজতলা

যে স্থানে পরিকল্পিত উপায়ে ভালো চারা উৎপাদনের সব নিয়ম মেনে (সঠিক স্থানে, সঠিক পরিচর্যা সহকারে ) সুস্থ সবল চারা উৎপাদন করা হয়, সেটাই হলো আদর্শ বীজতলা।

### আদর্শ বীজতলার সুবিধা

* আদর্শ বীজতলায় চারার পরিচর্যা ও পর্যবেক্ষণ করা সহজ হয়
* প্রতিকূল অবস্থা থেকে চারা রক্ষা করা সহজতর হয়
* সুস্থ-সবল চারা তৈরি হয় ও চারার মান উন্নত হয়

### বীজতলার স্থান নির্বাচন

* সূর্যের আলো পড়ে এমন স্থান নিতে হবে।
* সেচ নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো আছে এমন জায়গায় আদর্শ বীজতলা করতে হবে।
* বেলে দো-আঁশ ও উর্বর মাটি। মাটি উর্বর না হলে প্রতি বর্গমিটার স্থানে ২ কেজি হিসেবে গোবর/জৈবসার প্রয়োগ করতে হবে।
* পানির উৎসের কাছাকাছি বীজতলাগুলো করতে হবে।

### আদর্শ বীজতলা তৈরি ও পরিচর্যা

বীজতলা তৈরির আগে ২/১টি চাষ ও হালকা সেচ দেওয়ার পর পুরাতন পলিথিন দিয়ে বীজতলার মাটি ৭-১০ দিন ঢেকে রাখতে হবে। এতে প্রচণ্ড তাপে মাটির পোকামাকড়, রোগজীবাণু, আগাছা মরে যায়। প্রয়োজনমতো সেচ দিয়ে ২ থেকে ৩টি চাষ ও মই দিয়ে পানি আটকে ৭ থেকে ১০ দিন রেখে দিতে হবে। খড়কুটা, ঘাস, আগাছা ইত্যাদি পচে গেলে আবার চাষ ও মই দিয়ে থকথকে কাদাময় করে জমি তৈরি করতে হবে। এরপর জমির দৈর্ঘ্য বরাবর ১২০ সেন্টিমিটার চওড়া করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেড তৈরি করেতে হবে। প্রতি বেডের মাঝে ২৫ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার নালা রাখতে হবে। বীজতলার প্রতি বর্গমিটার ৮০-১০০ গ্রাম জাগ দেওয়া বীজ বপন করতে হবে।

বীজতলায় যখন চারা থাকে, বোরো মৌসুমে অনেক সময় শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়। ঘন কুয়াশায় চারা দুর্বল হয়। চারা হলুদ হয়ে যায়। তাই রাতে বীজতলা পলিথিনের ছাউনি দিয়ে ঢেকে চারা রক্ষা করতে হবে। বীজ বপনের ৩/৪ দিন পর বীজতলায় ছাই ছিটানো উচিত। এতে রোগবালাই কম হয়, শিকড় মজবুত হয়, চারা বাড়তি সার পায়, পাখি বীজ খায় না এবং মাটি নরম থাকে। এতে চারা তুলতে সহজ হয়। বীজতলায় সবসময় নালাভর্তি পানি রাখা উচিত। বীজ গজানোর ৪-৫ দিন পর বীজতলায় ২-৩ সেন্টিমিটার পানি ধরে রাখলে আগাছা ও পাখির আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। চারা হলুদ হলে প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করা ভালো। এতেও চারা সবুজ না হলে ১০ জিপসাম দেওয়া উচিত। বীজতলা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে রোগ-পোকা থাকলে ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজন হলে বীজতলার চারপাশে জাল দিয়ে বেড়া দেওয়া হলে হাঁসসহ অন্যান্য প্রাণীর ক্ষতি থেকে অঙ্কুরিত বীজ ও চারা রক্ষা করতে হবে।

# সেশন ১১ ধানের ভালো চারার বৈশিষ্ট্য, চারা তোলা এবং চারা রোপণ কৌশল

**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

সহায়তাকারী ধানের আদর্শ বীজতলা তৈরির গুরুত্ব ও পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করবেন। আদর্শ বীজতলা করা বা না করার তাঁদের যদি কোনো অভিজ্ঞতা থাকে, তবে তা সবার সাথে বিনিময় করাবেন। সম্ভব হলে কৃষকদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে দিয়ে তাঁদের জমিতে সে মৌসুমে আদর্শ বীজতলা করতে উৎসাহিত ও বাস্তবায়িত করবেন।

## সেশন সহায়িকা

### ভূমিকা

কাঙ্ক্ষিত ফলন পেতে হলে ধান চাষের প্রতিটি কৌশল সঠিকভাবে পালন করতে হবে। রোপণের জন্য চারা তোলার সময় কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে করে চারার কাণ্ড মুচড়ে না যায় বা ভেঙে না যায়। তোলা চারা সাবধানে মূল জমিতে নিয়ে জাত ও মৌসুম অনুযায়ী নির্দিষ্ট দূরত্বে নির্দিষ্ট গভীরতায় রোপণ করতে হবে। এতে প্রত্যেক গাছ সমানভাবে আলো, বাতাস ও সার গ্রহণের সুবিধা পাবে। ফলে চারার বাড়বাড়তি দ্রুত হবে এবং কুশির সংখ্যা বেশি হবে। তা না হলে আন্তঃপরিচর্যা সঠিকভাবে করা যাবে না, গাছ তার প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান সুষ্ঠুভাবে পাবে না, রোগ ও পোকার উপদ্রব বেড়ে যাবে এবং ফলনের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়বে।

### ধানের ভালো চারার বৈশিষ্ট্য

ধানের ভাল চারার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো চারা রোগ ও পোকার আক্রমণমুক্ত হবে। চারার কোথাও কোনো পোকার ডিম, কীড়া, পুত্তলি এবং কোনো ক্ষত থাকবে না। ধানের চারার পাতার নিচের অংশই হলো পত্রকোষ বা খোল যা চারার কাণ্ড ও কচি পাতাকে ঢেকে রাখে। সবল চারার পত্রকোষ খাটো থাকে। বীজ থেকে গজানোর পর প্রথম দিকেই চারার দ্রুত বাড়বাড়তির ফলে পত্রকোষ লম্বা হয়ে যায়। যার ফলে চারা দুর্বল হয়ে পড়ে। ভালো চারার কাণ্ড খাটো ও শক্ত সবল হবে। চারা শক্ত ও পাতাসমূহ খাড়া থাকবে। সুস্থ ও সবল চারার উচ্চতা এবং বাড়বাড়তি সমান হবে। সুস্থ সবল চারায় প্রচুর শিকড় থাকবে। পাতার রং স্বাভাবিক সবুজ থাকবে এবং পাতা কোঁকড়ানো বা বিকৃত হবে না।

### বীজতলা হতে চারা তোলার নিয়ম

চারা উঠানোর আগে বীজতলায় বেশি করে পানি দিতে হবে যাতে বীজতলার মাটি ভিজে একেবারে নরম হয়ে যায়। চারা উঠাতে এমন সাবধানতা নিতে হবে, যেন চারার কাণ্ড মুচড়ে বা ভেঙে না যায়। উঠানো চারার গোড়ার মাটি কাঠ বা হাতে আছাড় না দিয়ে আস্তে আস্তে পানিতে নাড়াচাড়া করে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এরপর শুকনো খড় ভিজিয়ে তা দিয়ে বান্ডিল বা আঁটি বাঁধতে হবে। উঠানো চারার পাতা দিয়ে বান্ডিল বাঁধা উচিত নয়।

### চারা পরিবহণ

ঝুড়ি বা টুকরিতে উঠানো ধানের চারা এক সারি করে সাজিয়ে ভারের সাহায্যে চারা পরিবহণ করে যে খেতে রোপণ করা হবে সেখানে নিতে হবে। বস্তাবন্দি করে ধানের চারা পরিবহণ করা ঠিক না।

### চারা রোপণ কৌশল

#### চারার বয়স

চারার বয়স আউশে ২০ থেকে ২৫ দিন, রোপা আমনে ২৫ থেকে ৩০ দিন এবং বোরোতে ৩৫ থেকে ৪৫ দিন হওয়া উচিত।

**রোপণ দূরত্ব**

**সারিবদ্ধভাবে নিম্নলিখিত দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে-**

| মৌসুম | চারা থেকে চারার দূরত্ব (সেমি:) | সারি থেকে সারির দূরত্ব (সেমি:) |
|---|---|---|
| রোপা আমন | ১৫ | ২০ - ২৫ ( জাতভেদে) |
| বোরো | ১৫ | ২০-২৫ (জাতভেদে ) |
| রোপা আউশ | ১৫ | ২০ |

* সাধারণত ফসলের জীবনকাল বেশি হলে সারির দূরত্ব একটু বেশি দিতে হয়।

**রোপণের গভীরতা**

মাটির ২-৩ সেন্টিমিটার গভীরতায় চারা রোপণ করা উত্তম।

**চারার সংখ্যা**

প্রতি গুছিতে নির্দিষ্ট বয়সের সুস্থ সবল ২টি চারা রোপণ করা যেতে পারে। রোপণের সময় জমিতে ছিপছিপে পানি থাকলেই চলে।

**শূন্যস্থান পূরণ**

চারা রোপণের ৭-১০ দিনের মধ্যে কোনো চারা মারা গেলে সেখানে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

**চারা রোপণের দশটি নিয়ম**
**(সহজে মনে রাখার জন্য ছড়াগান)**

১। তাড়াতাড়ি লাগাও চারা
২। ছিপছিপে পানি ধরা
৩। উত্তমরূপে জমি চাষ
৪। এক ইঞ্চি গভীরে বাস
৫। সঠিক বয়সের চারা
৬। L (এল) আকারে খাড়া
৭। গুছিতে দুই/তিন
৮। লাইন উত্তর দক্ষিণ
৯। পারলে ওষুধে চুবা
১০। কাটা ছেড়া বাদ দিবা

ধানের চারা তোলা

# সেশন ১২ ধান ফসলে সবুজ সার ও জৈবসারের পরিচিতি, সার ব্যবস্থাপনা ও আইপিএনএস

**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

সহায়তাকারী সকলকে ইউ আকারে বসাবেন ও কুশল বিনিময়ের পর সেশনের উদ্দেশ্য বলে আলোচনা শুরু করবেন। সহায়তাকারী প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন প্রকার জৈবসারের নমুনা প্রদর্শন করাবেন। পরিবেশসম্মতভাবে ধান চাষের জন্য কৃষকদের বেশি করে জৈবসার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করবেন। বিশেষ করে বোরো মৌসুমের পর ও রোপা আমন ধান লাগানোর আগে মধ্যবর্তী সময়ে অবশ্যই কৃষকদের সবুজ সার হিসেবে ধৈঞ্চার চাষ করে তা মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া উচিত তা জোর দিয়ে বলবেন। সুপারিশকৃত মাত্রায় জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে বলবেন, বিশেষ করে কোনোভাবেই যেন কৃষকরা অতিরিক্ত সার ব্যবহার না করেন ও ইউরিয়া সারের ব্যবহার অবশ্যই কমান। কী পরিমাণ জৈবসার দিলে কতটুকু রাসায়নিক সার কম দিতে হবে তার হিসাব করার নিয়ম শিখিয়ে দেবেন। সেসনের বর্ণনা ও ফিডব্যাক পিএফএস রেজিস্টারে লিখবেন।

## সেশন সহায়িকা

### ভূমিকা

উচ্চ ফলনশীল জাত স্থানীয় জাতের চেয়ে অধিক হারে মাটি থেকে খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণ করে থাকে। আবার প্রচলিত দেশি জাতগুলোও তাদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান মাটি হতে গ্রহণ করে থাকে। কৃষকরা মাটিতে জৈবসার প্রয়োগ না করে শুধু রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে থাকে, যা আবার সুষমও নয়। মাটিতে সঠিক মাত্রায় জৈব ও রাসায়নিক সারের সমন্বয়ে সুষম সার প্রয়োগ করা না হলে ধীরে ধীরে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। আবার একই জমিতে বারবার একই ফসল আবাদ করলেও সে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। তাই সঠিক পদ্ধতিতে জৈব ও রাসায়নিক সারের সমন্বয়ে সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করা অতীব জরুরি। তাই মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে বা এইজেডভিত্তিক নির্দিষ্ট ফসলের সার সুপারিশমালা প্রস্তুত করে মাটিতে তা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

### সার কী ?

গাছের বৃদ্ধি, পুষ্টি, ফলন ও গুণাগুণ বৃদ্ধির জন্য যে সকল পদার্থ গাছের খাদ্য হিসেবে মাটিতে প্রয়োগ করা হয়, তাকে সার বলা হয়।

### সারের প্রকারভেদ

সাধারণত সার দুই প্রকার। যথা: ক) জৈবসার ও খ) রাসায়নিক সার

ক) জৈবসার : জীবদেহ থেকে প্রাপ্ত বা প্রস্তুতকৃত সারকে জৈবসার বলে। যেমন: গোবর, খামারজাত সার

খ) রাসায়নিক সার : যে সার কৃত্রিম উপায়ে কলকারখানায় প্রস্তুত করা হয়, তাকে রাসায়নিক সার বলে। যেমন : ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি

### জৈবসার ব্যবহারের গুরুত্ব

জৈবসার ব্যবহার করলে মাটিতে জৈব পদার্থ সংযুক্ত হয়। জৈবসার মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মাটির স্বাস্থ্য উন্নত করে। তাই জৈবসার ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম। জৈবসারের গুরুত্বসমূহ হলো-

* জৈবসার মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ায়।
* মাটির সকল প্রকার ভৌত গুণাবলি যেমন; পানি ধারণ ক্ষমতা, বায়ু চলাচল ক্ষমতা, মাটির রং, মাটির বুনট ইত্যাদি উন্নত করে।
* মাটির অণুজীবের কার্যাবলি বাড়ায়।
* মাটির বিষাক্ততা দূর করে।
* মাটির পুষ্টিগুণ বাড়িয়ে মাটিকে উর্বর করে।

* মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায়।
* রাসায়নিক সার সাশ্রয় হয়।
* রাসায়নিক সারের কার্যকারিতা বাড়ায়।
* বিভিন্ন প্রকার জৈব আবর্জনার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

**বিভিন্ন প্রকার জৈবসার**

বহুল ব্যবহৃত জৈবসারসমূহ হলো গোবর সার, খামার জাত সার, কম্পোস্ট সার, সবুজ সার, বাদামি সার, ভার্মি কম্পোস্ট সার, মুরগির বিষ্ঠা পচানো সার সরিষা/তিল/তিসি/চিনাবাদাম খৈল, হাড়ের গুঁড়া ইত্যাদি।

**সবুজ সার**

সবুজ উদ্ভিদকে কচি ও সবুজ অবস্থায় মাটির সাথে মিশিয়ে পঁচিয়ে যে সার তৈরি করা হয়, তাকে সবুজ সার বলা হয়ে থাকে। সবুজ সার তৈরির জন্য নরম দ্রুত বর্ধনশীল উদ্ভিদ নির্বাচন করতে হবে যেগুলো অপেক্ষাকৃত অনুর্বর মাটিতে সহজে জন্মে। সবুজ সারের জন্য নির্বাচিত উদ্ভিদ শিমগোত্রীয় হলে খুবই ভালো হয়। ধৈঞ্চা, আফ্রিকান ধৈঞ্চা, শনপাট, ফেলন, খেসারি, মাষকলাই, মুগবিন, সয়াবিন ইত্যাদি সবুজ সার তৈরির জন্য উপযুক্ত ফসল। ধৈঞ্চা দিয়ে সবুজ সার তৈরির জন্য প্রথমে জমি নির্বাচন করে সামান্য চাষ দিয়ে বা বিনা চাষে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে জমিতে ধৈঞ্চার বীজ বুনে দিতে হবে। বোরো আবাদের পর ধৈঞ্চা দিয়ে সবুজ সার করে রোপা আমন লাগাতে হলে বোরো ধান কাটার পূর্বেই ধানখেতের মধ্যে ধৈঞ্চা বীজ ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং ধান কাটার সময় ধৈঞ্চা গাছ প্রায় এক ফুটের মতো বড় হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে জমিতে পানি থাকলে ধৈঞ্চা গাছ গজাবে না বা নষ্ট হয়ে যাবে। গাছের বয়স ৫০-৫৫ দিন হলে (ফুল আসার পূর্বে) জমিতে পানি ধরে রেখ চাষ দিয়ে ধৈঞ্চা গাছ মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এতে করে ধৈঞ্চা গাছ মাটিতে পচে সবুজ সার তৈরি হবে। মাটিতে ধৈঞ্চা গাছ মিশানোর ৭ দিনের মধ্যে রোপা আমনের চারা লাগালে হেক্টরপ্রতি ৬০-৯০ কেজি ইউরিয়া সার কম লাগে।

**সমন্বিত উদ্ভিদ পুষ্টি ব্যবস্থাপনা বা আইপিএনএস কী?**

সবসময় আশানুরূপ মাত্রায় ফলন পাওয়ার লক্ষ্যে জৈব ও অজৈব সার সহ সকল উদ্ভিদ পুষ্টির ব্যবস্থাপনা করাই হচ্ছে সমন্বিত উদ্ভিদ পুষ্টি ব্যবস্থাপনা। এ ব্যবস্থাপনায় কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে রাসায়নিক সার, জৈব সার, ফসলের পরিত্যক্ত অংশ, খামারজাত সার, কম্পোস্ট, সবুজ সার, শিম/শুঁটি জাতীয় ফসল, জীবাণু সার ইত্যাদির ব্যবহার হয়ে থাকে।

**জৈব ও রাসায়নিক সার সমন্বয়ের পদ্ধতি**

উক্ত জমিতে যদি জৈবসার ব্যবহার করে থাকেন বা করবেন, ধৈঞ্চা আবাদ করে মাটিতে মিশিয়ে থাকেন বা শুঁটি জাতীয় ফসল আবাদ করে থাকেন তাহলে সেই জৈবসারের পুষ্টি উপাদান বাদ দিয়ে প্রকৃত রাসায়নিক সারের পরিমাণ ঠিক করবেন। পুষ্টির পরিমাণকে সারের পরিমাণে রূপান্তর করবেন। যেমন- N x ২.১৭ = ইউরিয়া সার, P x ৫.০৮ = টিএসপি/ডিএপি সার, Kx ২.০০ = এমওপি সার, S x ৫.৫৬ = জিপসাম সার, Zn x ২.৭৮ = জিংক সালফেট সার।

**জৈবসার ব্যবহারের মাধ্যমে সারের সমন্বয়**

| | ইউরিয়া | টিএসপি | এমওপি | জিপসাম | দস্তা | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক) সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর) | | | | | | | | | | |
| খ) জৈব পদার্থ হতে প্রাপ্ত (গোবর, খামারজাত সার, সবুজ সার) | | | | | | | | | | |
| গ) রাসায়নিক সার দিতে হবে (ক-খ) | | | | | | | | | | |

# সেশন ১৩ সেচ সাশ্রয়ী এডব্লিউডি পদ্ধতিতে ধান ফসলের সেচ ব্যবস্থাপনা

**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সহায়তাকারী প্রশিক্ষণার্থীদের পর্যায়ক্রমে ভিজানো ও শুকানো পদ্ধতিতে সেচ কি, কেন দরকার, কীভাবে এ পদ্ধতিতে ধানের জমিতে সেচ দিতে হবে সেসব বিষয়ে আলোচনা করবেন। আলোচনার সময় একটি এডব্লিউডি পাইপ দেখাবেন, সেটি কীভাবে কখন ধান খেতে স্থাপনপূর্বক তার মাধ্যমে সেচের পানির ব্যবহার কমানো যাবে তা হাতে কলমে স্থাপন করে দেখাতে হবে। পর্যবেক্ষণের নিয়ম বলবেন। তথ্য পিএফএস রেজিস্টারে রাখবেন।

## সেশন সহায়িকা

### ভূমিকা

ধান চাষে প্রচুর পানি সেচের কাজে ব্যবহার করা হয়। এসব সেচের পানি প্রধানত মাটির নিচ থেকে তোলা হয়। এতে মাটির নিচের পানির মজুত কমে যাচ্ছে, প্রয়োজনের সময় সেচের পানি পাওয়া যায় না, সেচের খরচ বেড়ে যাচ্ছে ও জমি অবিরামভাবে অতিরিক্ত পানি ধরে রাখার ফলে ধানখেত থেকে মিথেন নামক গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গত হচ্ছে। এতে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। তাই ধানখেতে পর্যায়ক্রমে ভিজানো ও শুকানো পদ্ধতিতে সেচ দিলে পানি ও জ্বালানি সাশ্রয় হয়। এটি একটি পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি।

### এডব্লিউডি পরিচিতি

এডব্লিউডি পদ্ধতি হলো জমিতে পর্যায়ক্রমে ভিজানো ও শুকানোর মাধ্যমে প্রয়োজনমতো নিয়ন্ত্রিত সেচ দেওয়া। এ পদ্ধতিতে সেচ দিলে ধানখেতে ২৮% সেচের পানি সাশ্রয় হয়।

### এডব্লিউডি / ম্যাজিক পাইপ

ধানখেত শুকানোর পর কখন আবার সেচ দিতে হবে তা এডব্লিউডি পাইপ ব্যবহার করে বুঝা যায়। এটা বুঝার জন্য ধানখেতে একটি ছিদ্রযুক্ত বাঁশ বা পিভিসি পাইপ বসাতে হবে। এ পাইপ ধানখেতে মাটির গভীরে বসিয়ে পানির অবস্থা বা স্তর পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনমতো সেচ দেওয়াই হলো এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। এ পাইপটি ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও ৭-১০ সেন্টিমিটার ব্যাসের। পাইপের ওপরের ১০ সেন্টিমিটার বাদ দিয়ে বাকি ১৫ সেন্টিমিটার পাইপের গায়ে ৫ সেন্টিমিটার পরপর ৩ সুতি ব্যাসের ড্রিল বিট দিয়ে লম্বালম্বিভাবে সারি করে ছিদ্র করতে হবে।

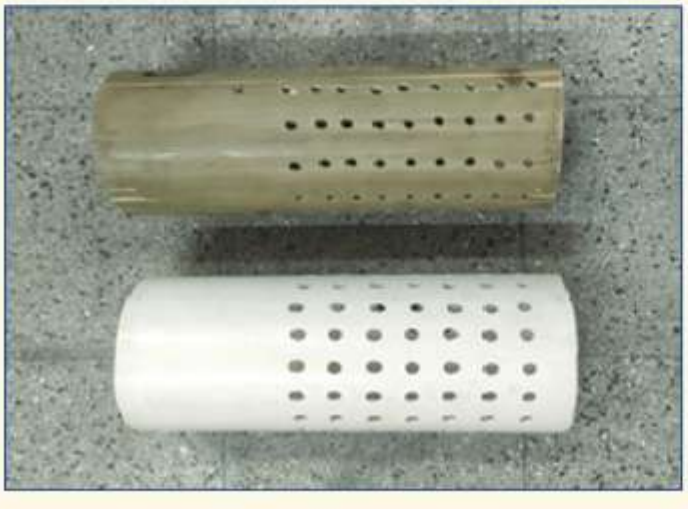

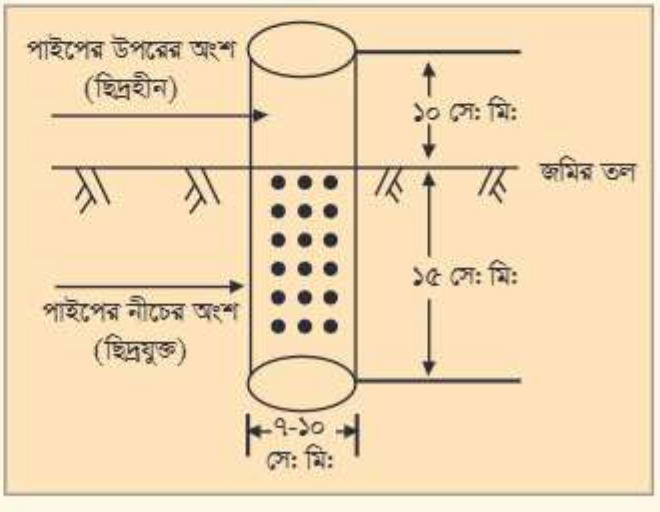

চিত্র: বাঁশ ও পিভিসির এডব্লিউডি পাইপ

চিত্র: এডব্লিউডি পাইপের নকশা

**এডব্লিউডি পাইপ ব্যবহার পদ্ধতি**

* এক একর পরিমাণ একটি সমতল ধানখেতে ২টি পাইপ বসাতে হবে।
* পাইপটি ধানখেতে এমনভাবে বসাতে হবে যেন এটির ছিদ্রহীন ১০ সেন্টিমিটার অংশটুকু মাটির ওপরে থাকে। ছিদ্রযুক্ত ১৫ সেন্টিমিটার মাটির নিচে থাকবে, যাতে মাটির ভিতরের পানি ছিদ্র দিয়ে পাইপে সহজে প্রবেশ করতে পারে ও পাইপ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।
* চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর্যন্ত জমিতে ২-৪ সেন্টিমিটার দাঁড়ানো পানি ধরে রাখতে হবে। এতে ঘাস কম হয়। এরপর ম্যাজিক পাইপ মাটিতে বসাতে হবে।
* এ পদ্ধতিতে প্রতিবার সেচের সময় এমন পরিমাণ পানি দিতে হবে যাতে জমির ওপরে ৫ সেন্টিমিটার গভীর পানি থাকে। এরপর পানির স্তর কমতে কমতে পানির গভীরতা যখন পাইপের ভিতরে ১৫ সেন্টিমিটার নিচে নেমে যাবে অর্থাৎ পাইপের তলায় মাটি দেখা যাবে ও খেতের মাটির ওপরে চুল পরিমাণ ফাটা দেখা যাবে কিন্তু একেবারে শুকিয়ে যাবে না, তখন আবার সেচ দিতে হবে। এ অবস্থা হতে মাটিভেদে ৫-৮ দিন সময় লাগে।
* এভাবে ফুল আসা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে সেচ দিয়ে যেতে হবে।
* ফুল আসার পর ২ সপ্তাহ পর্যন্ত জমিতে সবসময় ২-৪ সেন্টিমিটার পানি ধরে রাখতে হবে। কারণ, ধানগাছের প্রজননকালে ফুল ফোটা ও দানা গঠনের জন্য পানির দরকার। এ সময় পানির অভাব হলে গাছ কম খাদ্য গ্রহণ করতে পারে ও দানা কম পুষ্ট হয়। তাই পানি না থাকলে ফলন কমে যাবে।
* এরপর ধান কাটার ২ সপ্তাহ আগে সেচ বন্ধ করে দিতে হবে। তা না হলে ধানগাছ বেশিদিন সবুজ থাকে ও পাকতে বেশি সময় লাগে। এতে ঝড়-বাদলে ধানের ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

চিত্র: ধানের খেতে এডব্লিউডি বা ম্যাজিক পাইপ স্থাপন

# সেশন ১৪ ধানের উপকারী ও অপকারী পোকামাকড় সংগ্রহ, বাছাই ও শনাক্তকরণ

**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

প্রশিক্ষাণার্থীরা ৫টি দলে ভাগ করে দলভিত্তিক হাত জাল দিয়ে পোকা ধরবেন ও তা বিশ্লেষণ করে পোকার উপস্থিতি সম্পর্কে ধারণা নেবেন, হাতজাল দিয়ে প্রাপ্ত পোকাসমূহ শনাক্ত করা ও দলীয় প্রাপ্তিসমূহ উপস্থাপন করবেন। কৃষকদের দিয়ে সেগুলো বাছাই করানোর পর কোনগুলো উপকারী ও ক্ষতিকর পোকা সহায়তাকারী তা প্রশিক্ষণার্থীদের চেনাবেন। তাঁরা দলগতভাবে ৫টি দলে পোকামাকড় সংগ্রহ, বাছাই ও শনাক্ত করবেন। এক দল তাঁদের অভিজ্ঞতা অন্য দলের সাথে ভাগ করবেন।

## সেশন সহায়িকা

### ভূমিকা

পিএফএস-এ এটি একটি আনন্দদায়ক ও উপভোগ্য সেশন। কৃষকদের এ বিষয়ে বেশ আগ্রহ থাকে। ধানখেতের পোকামাকড় তাঁরা চিনতে চান। কোন পোকা ক্ষতি করে, কোন পোকা করে না- সেসব কথাও জানতে চান। তাই সহায়তাকারীর উচিত হবে তাঁদের এই আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে যতটা পারা যায় ধানখেতে উপস্থিত পোকামাকড়গুলো চিনিয়ে দেওয়া।

### শত্রু ও বন্ধু পোকা

দলভিত্তিক হাতজাল দিয়ে সংগৃহীত পোকাসমূহ পলিব্যাগে সংগ্রহ করার পরে ইথাইল এসিটেট দিয়ে অবশ করে সাদা বড় কাগজে নিম্নরূপভাবে বাছাই ও শনাক্তকরণ করবেন-

| শত্রু পোকা | বন্ধু পোকা | | |
|---|---|---|---|
| | পরভোজী | পরজীবী | পানিতে বসবাসকারী |
| বাদামি গাছফড়িং | মাকড়সা | ট্রাইকোগ্রামা | মাইক্রোভেলিয়া |
| পামরি পোকা | লেডি বার্ড বিটল | টেলিনোমাস | মেসোভেলিয়া |
| ধানের হলুদ মাজরা পোকা | ক্যারাবিড বিটল | টেট্রাসটিকাস | ওয়াটার স্ট্রাইডার |
| ধানের পাতা মোড়ানো পোকা | স্ট্যাফাইলিনিড বিটল | কোটেসিয়া | ওয়াটার স্করপিয়ন |
| ধানের শীষকাটা লেদা পোকা | ড্যামসেল ফ্লাই | স্টেনোব্রাকন | ওয়াটার স্কেভেনজার |
| নলিমাছি | ড্রাগন ফ্লাই | জ্যানথোপিম্পলা | ওয়াটার মিজারার |
| চুঙ্গি পোকা | এসাসিন বাগ | ট্যাকিনিড ফ্লাই | ওয়াটার বোটম্যান |

| | | | |
|---|---|---|---|
| সবুজ পাতা ফড়িং | ইয়ার উইগ | ট্যাকিনিড ফ্লাই | হুইরলিগিগ বিটল |
| ধানের স্কীপার পোকা | লম্বা শুঁড় উরচুঙ্গা | সিরফিড ফ্লাই | জায়েন্ট ওয়াটার বাগ |
| ধানের থ্রিপস পোকা | টাইগার বিটল | টেমিলুচা বোলতা | ব্যাক সুইমার |
| ধানের ছাতরা পোকা | গ্রাউন্ড বিটল | ক্যারপস বোলতা | |
| ধানের গান্ধি পোকা | স্টিং বাগ | | |
| খাটো শুঁড় ঘাসফড়িং | রিডুবিড বাগ | | |
| লম্বা শুঁড় উরচুঙ্গা | মিরিড বাগ | | |

### ৮টি বন্ধু জীব ছবি

ব্যাঙ

ক্যারাবিড বিটিল

মাকড়সা

ফিঙে পাখি

ড্রাগন ফড়িং

লেডি বার্ড বিটিল

ড্যামেসেল ফড়িং

বোলতা

### ১২টি শত্রু পোকার ছবি

মাজরা পোকা

বাদামী গাছ ফড়িং

গান্ধী পোকা

সবুজ পাতা পোকা

পামরী পোকা

পাতা মোড়ানো পোকা

নলি মাছি

চুঙ্গিপোকা

থ্রিকস

খাটো শুড় ঘাস ফড়িং

সবুজ শুড় লেদা পোকা

শীষকাটা লেদা পোকা

# সেশন ১৫ ধানখেতের কৃষি পরিবেশ বিশ্লেষণের ধারণা প্রদান ও এর মাধ্যমে বালাই ব্যবস্থাপনার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কৌশল সম্পর্কে আলোচনা

**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

সহায়তাকারী কৃষকদের দলগতভাবে ধানখেতের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও সঠিক ব্যবস্থাপনার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ যেন তাঁরা নিজেরাই নিতে পারে সে কৌশল/পদ্ধতি বুঝিয়ে বলবেন, আয়েসার মাধ্যমে অনুশীলন করাবেন। এ অধিবেশনে সহায়তাকারী এমনভাবে আলোচনা করবেন ও দেখাবেন, যেন তাঁরা ধানখেতের কৃষি পরিবেশ ও পরিবেশের যেসব উপাদান তাঁরা দেখলেন সেগুলোর মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে তাঁরা সহজে বুঝতে পারেন। শেষে তাঁরা যাতে ফসল ব্যবস্থাপনার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতা অর্জন করেন, সে ব্যাপারে তাঁদের সাহায্য করবেন।

## সেশন সহায়িকা

### ভূমিকা

ধানখেতের কৃষি পরিবেশ বিশ্লেষণ করে তার আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক ধান ফসলের ব্যবস্থাপনা করলে ফসল ভালো হয়। পার্টনার ফিল্ড স্কুলে এই চর্চা কৃষককে জমি ও ফসলের অবস্থা নিবিড়ভাবে দেখা ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা সৃষ্টি করে। কৃষক এর মাধ্যমে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন। এজন্যই আয়েসাকে কৃষক মাঠ স্কুলের হার্ট বলা হয়।

### পরিবেশ কী?

আমাদের চারপাশের জীব ও জড়সহ যা কিছু আছে সেগুলো নিয়েই আমাদের পরিবেশ।

### কৃষি পরিবেশ কী?

ফসলের সাথে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান যেমন, মাটি, পানি, আবহাওয়া, আগাছা, পোকামাকড়, রোগ, পানি, তাপমাত্রা, আলো ইত্যাদির যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা, তা-ই হলো কৃষি পরিবেশ।

### কৃষি পরিবেশ বিশ্লেষণ (AESA-Agro-Eco System Analysis):

কৃষি পরিবেশ বিশ্লেষণ বা আয়েসা হলো কৃষির সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল জৈবিক উপাদান। যেমন- ফসল, আগাছা, উপকারী পোকা, মাকড়সা, ক্ষতিকর পোকামাকড়, অণুজীব ইত্যাদি ও অজৈবিক উপাদান যেমন, মাটি, পানি, বাতাস, সার, আলো, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ইত্যাদি শনাক্ত করা, তাদের বর্তমান অবস্থা জানা এবং ফসলের ওপর তাদের পারস্পরিক প্রভাব বিশ্লেষণ করে ফসলের জন্য করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

### পিএফএস-এ আয়েসা অনুশীলনের ধাপসমূহ

১. প্রথমে ৫টি দল থেকে একজন করে নিয়ে অতিরিক্ত আরেকটি দল গঠন করতে হবে, যারা কৃষক প্লটের তথ্য সংগ্রহ করবেন। সংগৃহীত তথ্যসমূহ একটি সাদা কাগজে লিখে বোর্ডে লাগিয়ে রাখতে হবে যাতে অন্যান্য দল আইসিএম প্লটের তথ্য উপস্থাপনার সময় তুলনার জন্য এটি ব্যবহার করতে পারেন। কৃষক প্লটের জন্য আয়েসা অঙ্কন করার দরকার নেই।

২. একই সাথে মূল ৫টি দল আইসিসএম প্লটে আয়েসা তথ্য সংগ্রহ ও প্লট পর্যবেক্ষণ করবেন। সকল তথ্য ও পর্যবেক্ষণ অঙ্কন ও বিশ্লেষণ শেষে উপস্থাপিত হবে।

৩. উপস্থাপন চলাকালীন সহায়তাকারী প্রতিটি দলের উপস্থাপিত তথ্য/বিষয়ের গড় (৫ দলের) কৃষক প্লটের সাথে তুলনা করার জন্য ও রেকর্ড রাখার জন্য একীভূত করবেন।

৪. উপস্থাপন শেষে সহায়তাকারী সকল সিদ্ধান্ত বা মতামতের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করবেন।

৫. আয়েসার সিদ্ধান্তসমূহ ও উল্লেখযোগ্য তথ্য এফএফএস রেজিস্টারে আইসিএম প্লটের পর্যবেক্ষণ অংশে লিপিবদ্ধ করবেন।

## (আয়েসার ছক)

----------ফিল্ড স্কুল

দল: তারিখ:

ফসলবিন্যাস: ফসল:

জমির ধরন: জাত:

মাটির ধরন: গড় কুশির সংখ্যা:

রোপণ তারিখ: গড় পাতার সংখ্যা:

রোপণোত্তর দিবস: গড় উচ্চতা:

| শত্রু পোকা | ফসল | বন্ধু পোকা |
|---|---|---|
| | | |
| মোট = | | মোট = |

| পর্যবেক্ষণের বিষয় | পর্যবেক্ষণ | সিদ্ধান্ত | |
|---|---|---|---|
| ১. আবহাওয়া | | | |
| ২. মাটির রস | | | |
| ৩. আগাছা | | | |
| ৪. সারের অভাবজনিত লক্ষণ | | | |
| ৫. রোগ (কম/মধ্যম/বেশি) | | | |
| ৬. ফসলের সার্বিক অবস্থা | | | |

ধানখেতে আয়েসার তথ্য সংগ্রহ

# সেশন ১৬ ধানখেতের আগাছা পরিচিতি ও তার সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

সহায়তাকারী কৃষকদের দলগতভাবে ধানখেতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আগাছা সংগ্রহ করাবেন। তাঁরা কোনটি কী নামে চেনেন তা জানতে চাইবেন। কেন সেগুলো আগাছা তা বলবেন, কেন আগাছা দমন করতে হবে, কখন ও কীভাবে তা দমন করতে হবে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবেন।

## সেশন সহায়িকা

### ভূমিকা

পোকামাকড় ও রোগের মতো আগাছাও ধানখেতের বালাই। আগাছা ধান ফসলের সাথে স্থান, পানি ও খাদ্য নিয়ে প্রতিযোগিতা করে। অধিকাংশ কৃষক যথাযথভাবে সময়মতো আগাছা দমন করেন না। প্রায়শ দেরি করে আগাছা নিড়ানো হয়। এ কারণে ধান ফসল আগাছার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আগাছা ধানের ফলন কমিয়ে দেয়, উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দেয়, বীজের মান কমিয়ে দেয় এবং বহু রোগ ও পোকামাকড়ের বিকল্প পোষক হিসেবে কাজ করে, ইঁদুরকে আশ্রয় দেয়। ফসলের জমিতে আগাছা একটি চিরাচরিত সমস্যা। বাংলাদেশে বহু প্রজাতির আগাছা জন্মালেও আগাছা বিজ্ঞানীরা নিচু জমির ধানখেতে ৯ প্রজাতির ও উঁচু জমির ধানখেতে ১০ প্রজাতির আগাছাকে মুখ্য ক্ষতিকর আগাছা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

### আগাছার বৈশিষ্ট্য

যেসব স্বভাব বা বৈশিষ্ট্যের জন্য আগাছা ধান চাষের জন্য একটি সমস্যা, তা হলো- আগাছা চাষ ছাড়াই জন্মাতে পারে, দ্রুত বর্ধনশীল, প্রতিকূল অবস্থায় জন্মাতে পারে ও বেঁচে থাকতে পারে, অসংখ্য বীজ উৎপাদন করতে পারে, দ্রুত বংশবিস্তার করতে পারে, রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়, দমন করা খুবই কঠিন, আগাছার বীজ হালকা, তাই বাতাসের মাধ্যমে সহজেই বিস্তার লাভ করতে পারে।

### বাংলাদেশে ধানখেতের গুরুত্বপূর্ণ আগাছাসমূহ

আগাছাগুলোর মধ্যে ধানখেতে সবচেয়ে ক্ষতিকর বা প্রভাব বিস্তারকারী আগাছা হিসেবে সাধারণভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে শ্যামাকে। এরপর রয়েছে যথাক্রমে চেঁচড়া > দূর্বা > পানিকচু > বড় চেঁচুয়া > হলদে মুথা > ঝিলমরিচ > বড় জাভানি। ধানখেতের গুরুত্বপূর্ণ আগাছাগুলো হলো:

(ক) রোপা ধানখেতের আগাছা- হলদে মুথা, শ্যামা, চেচড়া, পানিকচু, আমরুল, দূর্বা, ঝিলমরিচ ও কেশুঁটি।

(খ) বোনা ধানখেতের আগাছা- চেঁচড়া, শ্যামা, দূর্বা, বড় চেঁচুয়া, অঙ্গুলি ঘাস, ফুলকা ঘাস, বনচিনা বা বারান্দা ঘাস, হলদে মুথা, শালুক, আমরুল ও বড় জাভানি।

### সমন্বিত আগাছা ব্যবস্থাপনা

এক সময় ধানের জমির আগাছা হাতেই নিড়ানো হতো। এতে সময়, শ্রম ও খরচ বেড়ে যাওয়া ও শ্রমিকের অভাবেরর কারণে কৃষকরা আগাছানাশক ব্যবহারের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং অনেকেই আগাছানাশক ব্যবহারকেই আগাছা নিয়ন্ত্রণের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। এতে বিপত্তি বাঁধে এই যে, অনেক আগাছা আগাছানাশকগুলোর প্রতি প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে। এতে আগাছানাশক প্রয়োগ করেও আর আগাছা দমন করা যাচ্ছে না। এজন্য এখন বিকল্প উপায় খুঁজতে হচ্ছে। আগাছা বিজ্ঞানীরা এখন তাই সমন্বিত আগাছা ব্যবস্থাপনার কথা বলছেন। সমন্বিত আগাছা ব্যবস্থাপনা হলো একাধিক পদ্ধতি একযোগে ব্যবহার করে কার্যকরভাবে আগাছাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার একটি উপায়। এর উদ্দেশ্য হলো কোনো উৎপাদন মৌসুমে দক্ষতার সাথে সমস্যা সৃষ্টিকারী আগাছাগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, যাতে সেগুলো ফসলের কোনো আর্থিক ক্ষতি ঘটাতে না পারে। সমন্বিত আগাছা ব্যবস্থাপনা হলো-

**(ক) চাষাবাদ ব্যবস্থাপনা :** আগাছামুক্ত বীজ ব্যবহার, সঠিকভাবে জমি চাষ ও বীজতলা তৈরি, যথাযথভাবে পানি ব্যবস্থাপনা, হাতে আগাছা নিড়ানো (আগাছার সাথে ধানগাছের প্রতিযোগিতা এড়ানোর জন্য চারা রোপণের ১৪, ৩০ ও ৪৫ দিন পর ৩ বার আগাছা নিড়াতে হবে)।

**(খ) যান্ত্রিক পদ্ধতি :** আগাছা নিড়ানো যন্ত্র যেমন ব্রি-উইডার ব্যবহার + হাতে নিড়ানো (৩০-৩৫ দিনের মধ্যে), শক্তিচালিত উইডার বা আগাছা নিড়ানো যন্ত্র দিয়ে + হাতে নিড়ানো (৩০-৩৫ দিনের মধ্যে)।

**(গ) জৈবিক পদ্ধতি :** জৈবিক পদ্ধতিতে কোনো জীব বা অণুজীব অথবা অন্য কোনো উদ্ভিদের সাহায্যে আগাছা দমনের উপায়। ভারতের তামিলনাড়ুতে এক ধরনের কৃমি *(Manniella spinicaudata)* জীবাণু ব্যবহার করে ধানের উঁচু জমির আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা গেছে। অ্যাজোলাও আগাছা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ভেজা বা জলা জমিতে অ্যাজোলা মাদুরের মতো জমির উপরে আচ্ছাদন তৈরি করে রাখায় অনেক আগাছা গজাতে পারে না।

**(ঘ) রাসায়নিক পদ্ধতি :** প্রি-ইমারজেন্স বা পোস্ট-ইমারজেন্স আগাছানাশক ব্যবহার। প্রি-ইমারজেন্স আগাছানাশক হলো এমন আগাছানাশক যা ধানের চারা রোপণের পর কিন্তু আগাছা গজানোর আগে ব্যবহার করা হয়। পোস্ট-ইমারজেন্স আগাছানাশক হলো, যা ধানগাছের চারা রোপণের পর মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে প্রয়োগ করা হয়। সঠিক আগাছানাশক সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতিতে ও সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করা।

**ধানখেতের আগাছা ব্যবস্থাপনার সাধারণ নিয়ম**

* ধানের জমিতে আউশ মৌসুমে প্রথম বৃষ্টিপাতের পর জমিতে দু একটি চাষ দিয়ে জমি কিছুদিন পতিত অবস্থায় রেখে দিলে আগাছার বীজ গজিয়ে ওঠে। এ অবস্থায় আবার চাষ ও মই দিয়ে ধানের বীজ বপন করলে আগাছার প্রাদুর্ভাব অনেকটা কমে যায়।
* রোপা ধানের ক্ষেত্রে জমিতে সবসময় ৫ থেকে ১০ সেন্টিমিটার পানি রাখতে পারলে আগাছা কম গজায়। ধানের চারা রোপণের পর থেকে ধান পাকা পর্যন্ত ধান গাছ যতদিন মাঠে থাকে, তার তিন ভাগের একভাগ সময় জমিকে আগাছামুক্ত রাখতে পারলে ভালো ফলন পাওয়া সম্ভব।
* বীজ বোনা ও চারা রোপণের পর আউশ ও আমন মৌসুমে ৩০ থেকে ৪০ দিন এবং বোরো মৌসুমে ৪০ থেকে ৫০ দিন জমি আগাছামুক্ত রাখা উচিত।
* হাত দিয়ে, নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে, আগাছানাশক এবং জৈবিক পদ্ধতি ব্যবহার করে আগাছা দমন করা যেতে পারে।
* রোপা ধানে কমপক্ষে দুইবার আগাছা দমন করা উচিত। প্রথম বার ধানের চারা রোপণের ১৫ দিন পর এবং দ্বিতীয় বার ধানের চারা রোপণের ৩০ থেকে ৩৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে।
* জমিতে পানির পরিমাণ ১০ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার রাখতে পারলে দুবার হাত নিড়ানি দিয়ে আগাছা দমন করলেই চলবে।
* আউশ বা রোপা আমন মৌসুমে জমি শুকিয়ে গেলে বা বোরো মৌসুমে সেচ দিতে দেরি হলে আগাছার পরিমাণ বেড়ে যায়। সে ক্ষেত্রে আরও একবার হাত নিড়ানি দিয়ে আগাছা দমন করতে হবে। তবে এভাবে আগাছা দমনে অধিক শ্রমিক ও সময় লাগে এবং আগাছা দমন ব্যয়ও বেশি হয়। প্রত্যেক বার ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের আগে আগাছা নিড়িয়ে ফেলতে হবে। শুধু জমির ভেতরের আগাছাই নয়, আইলের আগাছাও পরিষ্কার করে রাখতে হবে।
* শীষ বের হওয়ার পর কোনো আগাছা পরিষ্কার করার দরকার নেই। এ সময় ধান গাছের নাড়াচাড়া করলে ফলন কমে যায়। প্রয়োজনে চারা রোপণের পর বা সুবিধাজনক সময়ে জমিতে অনুমোদিত আগাছানাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে।

শ্যামা ঘাস

হলদে মুথা

বড় নখা

# সেশন ১৭ ধানের রোগের লক্ষণ বা নমুনা সংগ্রহ, বাছাই ও শনাক্তকরণ

**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

সহায়তাকারী কৃষকদের দলগতভাবে ধানখেত থেকে হাতে রোগের নমুনা সংগ্রহ করে কৃষকদের দিয়ে সেগুলো বাছাই করানোর পর কোনটি কী রোগ তা চেনাবেন। এসব রোগের লক্ষণ তাঁরা আগে দেখেছেন কি না, দেখলে তার নাম জানেন কি না তা জানতে চাইবেন। প্রতিটি দল তাদের সংগৃহীত নমুনা একে অন্য দলের সদস্যদের দেখাবেন ও নাম বলবেন। এতে করে তাদের অনেকগুলো রোগ চেনা হয়ে যাবে।

## সেশন সহায়িকা

### ভূমিকা

পিএফএস-এ এটি একটি আনন্দদায়ক ও উপভোগ্য সেসন। কৃষকদের এ বিষয়ে বেশ আগ্রহ থাকে। ধানখেতের পোকামাকড় তাঁরা চিনতে চান। কোন পোকা ক্ষতি করে, কোন পোকা করে না, সেসব কথাও জানতে চান। তাই সহায়তাকারীর উচিত হবে তাঁদের এই আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে যতটা পারা যায় তাঁদের ধানখেতে উপস্থিত রোগগুলো চিনিয়ে দেওয়া।

### রোগ শনাক্তকরণ

দলভিত্তিক ধানখেত থেকে বিভিন্ন রোগের নমনা সংগ্রহ করার পর সাদা বড় কাগজে নিম্নরূপভাবে বাছাই করে তার নিচে রোগগুলোর নাম লিখে শনাক্তকরণ করবেন-

### ৮টি রোগের ছবি

খোল পচা রোগ

খোল পোড়া রোগ

টুংরো রোগ

পাতা পোড়া রোগ

বাকানি রোগ

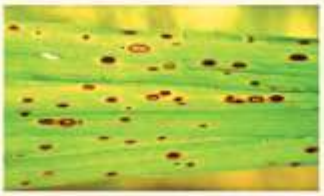
বাদামি দাগ রোগ

ব্লাস্ট রোগ

লক্ষ্মীর গু রোগ

# সেশন ১৮ কৃষকদের ধানখেতের রোগ ব্যবস্থাপনা

**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

সহায়তাকারী অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে কৃষকদের কাছে জানতে চাইবেন, ধানের রোগ কী? রোগ কীভাবে হয়? রোগ হলে ধানগাছের কী ক্ষতি হয়? তারা কী কী রোগের নাম জানেন, আরও কী কী গুরুত্বপূর্ণ রোগ আছে। ধানের গুরুত্বপূর্ণ রোগগুলোর পরিবেশসম্মত সমন্বিত ব্যবস্থাপনার সাধারণ কৌশলসমূহ সহায়তাকারী আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে কোন রোগের ব্যবস্থাপনায় কৃষকদের কী কী অভিজ্ঞতা রয়েছে তা বিনিময় করবেন।

## সেশন সহায়িকা

### ভূমিকা

পোকার মতো রোগও ধান ফসলের জন্য ক্ষতিকর। তাই কৃষকদের ধানের রোগগুলো চেনানো দরকার। সেসব রোগ কেন হয় ও নিয়ন্ত্রণ কীভাবে করতে হবে, সে সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা কৃষকদের থাকা দরকার।

### ধানের রোগ

ধানগাছে যেসব অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় যার কারণে ধানগাছের ও ফলনের ক্ষতি হয় সেগুলোই রোগ। রোগ হলে ধানগাছে তা কিছু বিশেষ ধরনের লক্ষণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ধানের ৩২টি রোগ শনাক্ত করা হয়েছে।

### ধানের রোগ কেন হয়

রোগ হওয়ার জন্য প্রয়োজন দুর্বল পোষক (গাছ), জীবাণু ও অনুকূল পরিবেশ। সুতরাং, রোগ ব্যবস্থাপনার জন্য জীবাণুর অনুকূল পরিবেশ নষ্ট করা গুরুত্বপূর্ণ।

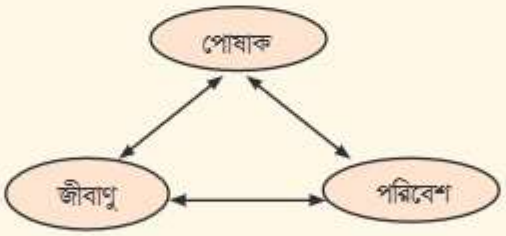


### বাংলাদেশে ধানের প্রধান প্রধান রোগ

| রোগের নাম | রোগের কারণ | গাছের কোন অংশে আক্রমণ করে | গাছের কোন অবস্থায় আক্রমণ করে |
|---|---|---|---|
| খোলপোড়া | ছত্রাক | খোল ও পাতা | কুশি গজানোর শেষ অবস্থায় |
| ব্লাস্ট | ছত্রাক | পাতা কাণ্ডের গিট ও শীষের গিট | গাছের সকল অবস্থায় |
| কাণ্ড পচা | ছত্রাক | খোল ও কাণ্ড | কুশি গজানো অবস্থায় |
| পাতাফোস্কা | ছত্রাক | পাতা | থোড় অবস্থায় |
| খোলপচা | ছত্রাক | ডিগ পাতার খোল | থোড় অবস্থায় |
| গোড়াপচা ও বাঁকানি | ছত্রাক | চারার গোড়া ও কাণ্ড | চারা |
| বাদামি দাগ | ছত্রাক | পাতা ও বীজ | গাছের সকল অবস্থায় |
| টুংরো | ভাইরাস | পাতা ও কালক্রমে সমস্ত গাছ | চারা ও কুশি গজানো অবস্থায় |
| পাতাপোড়া | ব্যাকটেরিয়া | পাতা ও চারা | গাছের সকল অবস্থায় |
| উফরা | কৃমি | কুশির অগ্রভাগ, পাতার গোড়া, খোল ও শীষ | কুশি গজানোর সময় থেকে |

ধানের প্রধান প্রধান রোগ দমনে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

১. রোগ প্রতিরোধী বা রোগ সহনশীল জাতের চাষ: টুংরো, পাতা পোড়া, খোল পোড়া, কাণ্ড পচা, ব্লাস্ট, পাতাফোস্কা, খোলপচা, গোড়া পচা ও বাকানি, বাদামি দাগ, উফরা ইত্যাদি রোগ রোগ প্রতিরোধী বা রোগ সহনশীল জাতের চাষ করে রোগের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

২. রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করুন: রোগাক্রান্ত বীজ রোগের প্রাথমিক উৎস। ব্লাস্ট, পাতাফোস্কা, খোলপচা, গোড়া পচা ও বাকানি, বাদামি দাগ রোগ, চারা পোড়া ইতাদি রোগ রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করে কমিয়ে রাখা যায় বা দমন করা যায়।

৩. আগাছা বা বিকল্প পোষক ধ্বংস করুন: টুংরো, উফরা ইত্যাদি রোগ দমনের জন্য আগাছা বা বিকল্প পোষক ধ্বংস করতে হবে।

৪. বাহক পোকা দমন করতে হবে: অনেক সময় পোকা রোগের জীবাণু বহন করে। টুংরো রোগ দমনের জন্য সবুজ পাতাফড়িং পোকা দমন করতে হবে।

৫. আক্রান্ত গাছ ও পাতা পরিষ্কার করুন: টুংরো, খোল পোড়া, গোড়া পচা ইত্যাদি রোগ ব্যবস্থাপনার জন্য আক্রান্ত গাছ ও পাতা পরিষ্কার করুন।

৬. অতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহার না করা: নাইট্রোজেনঘটিত সারের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার রোগের আক্রমণ বাড়ায়। পাতা পোড়া, ব্লাস্ট, পাতাফোস্কা, খোলপচা, গোড়া পচা ও বাঁকানি, কাণ্ড পচা ইতাদি রোগ ব্যবস্থাপনার জন্য অতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহার করা যাবে না।

৭. সুষম সার ব্যবহার করুন: সুষম সারের ব্যবহার সব ধরনের রোগকে প্রতিহত করে বা কমিয়ে রাখে। পাতা পোড়া, ব্লাস্ট, পাতাফোস্কা, খোল পচা, গোড়া পচা ও বাকানি, কাণ্ড পচা, বাদামি দাগ ইতাদি রোগ ব্যবস্থাপনার জন্য সুষম সার ব্যবহার করতে হবে।

৮. পানি শুকিয়ে ফেলুন: পাতা পোড়া, খোল পোড়া, কাণ্ড পচা, পাতাফোস্কা, খোল পচা, গোড়া পচা ও বাঁকানি, চারা ধসা ইত্যাদি রোগের আক্রমণ হলে খেতের পানি শুকিয়ে ফেলুন। কিছুদিন পরে আবার পানি প্রয়োগ করুন।

৯. পানি ধরে রাখুন: বাদামি দাগ রোগ, চারা পোড়া, ব্লাস্ট ইত্যাদি রোগ ব্যবস্থাপনার জন্য জমিতে পানি ধরে রাখতে হবে।

১০. ধানের নাড়া ও খড় পচানো বা ধ্বংস: রোগের জীবাণু ধানের নাড়া ও খড়ের মধ্যে বেঁচে থাকে ও পরবর্তী ফসলে আক্রমণ করে। ধানের নাড়া ও খড় পুড়িয়ে পাতা পোড়া, খোল পোড়া, কাণ্ড পচা, পাতাফোস্কা, উফরা রোগ ব্যবস্থাপনা করা যায়। তবে এতে পরিবেশ দূষণ হয় বিধায় ফসলের এসব আবর্জনা না পুড়িয়ে পচিয়ে জৈবসার উৎপাদন করা উচিত।

১১. চারা নির্দিষ্ট দূরত্বে রোপণ করুন: ঘন করে চারা রোপণ করলে রোগের আক্রমণ বেড়ে যায়। তাই রোগ ব্যবস্থাপনার জন্য চারা নির্দিষ্ট দূরত্বে রোপণ করুন।

১২. চারার ক্ষত রোধ করুন: চারার ক্ষত হলে পাতাপোড়া রোগ বেড়ে যায়। কাজেই বীজতলা থেকে চারা সাবধানে উত্তোলন করুন।

১৩. শস্য পর্যায় অনুসরণ করুন: রোগ ব্যবস্থাপনার জন্য শস্য পর্যায় অনুসরণ করতে হবে। উফরাসহ অধিকাংশ রোগ ব্যবস্থাপনার জন্য এটি কার্যকর।

১৪. সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে রোগনাশক ব্যবহার করুন: উপর্যুক্ত ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি প্রয়োজনে সঠিক রোগনাশক সঠিক মাত্রায় সঠিক সময়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ধানক্ষেতের ব্লাস্ট রোগ

# সেশন ১৯ ধান খেতে উপকারী জীব সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং সেগুলোর বংশবৃদ্ধি ও লালন-পালন

**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

সহায়তাকারী কৃষকরা যাতে ধানখেতে উপকারী জীবের বংশবৃদ্ধি ও লালন-পালনের সব পদ্ধতি অনুসরণ ও বাস্তবায়ন সহজে করতে পারেন, সেগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবেন।

## সেশন সহায়িকা

### ভূমিকা

ধান ফসলে অসংখ্য উপকারী ও ক্ষতিকর পোকা রয়েছে। এদের বেশিরভাগই উপকারী পোকা। কৃষক পোকা দেখামাত্রই কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করে এর কারণ উপকারী পোকার জগত সম্পর্কে তাঁদের ধারণা কম। উপকারী পোকা কীভাবে উপকার করে তা যদি কৃষক জানতে পারেন, সে মোতাবেক ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। ধানের জমিতে উপকারী ও ক্ষতিকর পোকাসমূহ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। একটির সংখ্যা বাড়লে অন্যটি কমে যায়, একটি কমলে অন্যটি বেড়ে যায়। এভাবে প্রকৃতিতে ৯০ ভাগের উপরে ক্ষতিকর পোকাকে উপকারী পোকা খেয়ে আমাদের ফসলকে রক্ষা করছে। তাই এসব উপকারী পোকা সম্পর্কে কৃষকদের জানা ও সেগুলো ধান খেতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত।

### ধানখেতের উপকারী জীব

ধানখেতে শুধু পোকা ও মাকড়সা না, অনেক জীবও আছে যারা ফসলের ক্ষতিকর পোকাকে ধ্বংস করে। যেমন ফিঙে পাখি, ব্যাঙ, প্যাঁচা ইত্যাদি। এসব উপকারী জীব হলো কৃষকের বন্ধু জীব। ধানখেতে সাধারণত দুই ধরনের বন্ধু জীব দেখা যায়-

(ক) পরভোজী বন্ধু জীব: যে সকল পোকামাকড় অন্য পোকাকে ধরে/আক্রমণ করে/শিকার করে খেয়ে জীবন ধারণ করে, এদের পরভোজী পোকা বলে। যেমন- মাকড়সা, লেডিবিটল, ক্যারাবিড বিটিল, ব্যাঙ, ফিঙে পাখি, শালিক পাখি ইত্যাদি। এসব পরভোজী উপকারী জীবের বৈশিষ্ট্য হলো একটি পরভোজী জীব বিভিন্ন প্রজাতির অনেকগুলো ক্ষতিকর পোকা খায়, এরা শিকারকে খেয়ে তার রস চুষে তাৎক্ষণিকভাবে মেরে ফেলে, পরভোজী পোকাদের বাচ্চা ও পূর্ণবয়স্ক উভয়ই ক্ষতিকর পোকাকেই এরা শিকার করে। কোন উপকারী পোকা কোন ক্ষতিকর পোকাকে শিকার করে তা নিচের তালিকায় দেওয়া হলো-

| পরভোজী পোকার নাম | শিকারের নাম | শিকার সংখ্যা /দিন |
|---|---|---|
| মাকড়সা | সবুজ পাতাফড়িং, বাদামী গাছফড়িং, পাতা মোড়ানো, পাতা মাছি, সকল প্রকার মথ | ২-১৫টি |
| ক্যারাবিড বিটল | পাতা মোড়ানো পোকার কীড়া, সবুজ পাতাফড়িং, মাজরার কীড়া, বাদামি গাছফড়িং | ৩-৫টি |
| লেডিবাড বিটল | সবুজ পাতাফড়িং, বাদামি গাছফড়িং, মাজরা ও পাতা মোড়ানো পোকার ডিম ও ছোট কীড়া | ৫-১০টি |
| লম্বাসুড় ঘাসফড়িং (পেট হলুদ) | সবুজ পাতাফড়িং, বাদামি গাছফড়িং এর ডিম ও ছোট বাচ্চা, মাজরা ও গান্ধির ডিম | ৩-৪টি |
| ইয়ার উইগ | মাজরা ও পাতা মোড়ানো পোকা | ২০-৩০টি |
| ড্রাগন ফ্লাই | সবুজ পাতাফড়িং, বাদামি গাছফড়িং, মাজরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা | ৩-৪টি |
| ড্যামসেল ফ্লাই | সবুজ পাতাফড়িং, বাদামি গাছফড়িং, মাজরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা | ৩-৪টি |
| মিরিডবাগ | সবুজ পাতাফড়িং, বাদামি গাছফড়িং এর ডিম ও ছোট বাচ্চা | ৪-১০টি |
| এসাসিন বাগ | মাজরার ছোট কীড়া | ৩-৪টি |
| মাইক্রোভেলিয়া | সবুজ পাতাফড়িং, বাদামি গাছফড়িং, মাজরা পোকার ছোট বাচ্চা | ৪-৭টি |

(খ) পরজীবী বন্ধু জীব: যেসব পোকা অন্য পোকার দেহের ওপর বা ভিতরে তার জীবনের একটি অংশ কাটায় এবং ঐ পোকাকে মেরে ফেলে, এদের পরজীবী পোকা বলে। সাধারণত একটি পরজীবী পোকার তার জীবনকাল সম্পন্ন করার জন্য একটি মাত্র পোষক পোকার প্রয়োজন হয়। সাধারণ পরজীবী যেমন মানুষের মাথার উঁকুন, পেটের কৃমি পোষককে মারে না কিন্তু পোকার পরজীবী পোষককে মেরে ফেলে। যেমন-বোলতা ও মাছি। এরা ক্ষতিকর পোকার ডিম, কীড়া, পুত্তলি, পূর্ণাঙ্গ পোকার দেহে পরজীবিতা দ্বারা মেরে ফেলে। এদের বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা বেশি ও দ্রুত গতিসম্পন্ন।

উপকারী জীব সংরক্ষণের উপায়

ধানখেতে উপকারী জীব সংরক্ষণের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো খেতে কোনো কীটনাশক প্রয়োগ না করা। খেতে ওদের খাদ্য এবং থাকা বা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারলে তারা সেখান থেকে সহজে অন্য খেতে যায় না। খেতের মধ্যে কঞ্চি বা ডাল পুঁতে দিলে তাতে বিভিন্ন পোকাখেকো পাখিরা বসার আশ্রয় পায়, খড়ের বল বানিয়ে কাঠির মাথায় মশালের মতো বেঁধে খেতের মধ্যে স্থাপন করলে তা মাকড়সাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। খেতের আইলে শিম বা ফুলজাতীয় সবজি চাষ করলে সেসব ফুলের মধু খেতে অনেক বোলতারা আসে। ফলে ওদের খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়। অনেক সময় খেতের মধ্যে রোগগ্রস্ত মরা কীড়া বা লেদা পোকা দেখা যায়। এগুলো সংগ্রহ করে পানিতে শরবতের মতো গুলে খেতে স্প্রে করলে সেসব রোগাক্রান্ত কীড়ার উপকারী রোগজীবাণু খেতে ছড়িয়ে পড়ে ও জীবিত কীড়াদের মেরে ফেলে। পরজীবিতার দ্বারা যদি মরা কোনো ডিমের গাদা, পুত্তলি বা কীড়া দেখা যায়, তাহলে সেগুলো সংগ্রহ করে পলিব্যাগের মধ্যে লালন করলে দু-চার দিনের মধ্যেই তা থেকে বোলতা বেরিয়ে আসে। পলিব্যাগের মুখ খুলে খেতে ছেড়ে দিলে সেখানে ওদের সংখ্যা বেড়ে যায়।

ধান খেতের আইলে সবজি চাষ

# সেশন ২০ নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা

**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

এটি একটি সচেতনা সৃষ্টির সেসন। এই সেসনে সহায়তাকারী অংশগ্রহণকারী কৃষক-কিষাণীদের নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে ধারণা দেবেন। বিশেষ করে তারা এ সেসন শেষে যেন বুঝতে পারেন, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য কি, কিভাবে রোজ আমাদের খাদ্য অনিরাপদ হচ্ছে, খাদ্যকে নিরাপদ রাখতে আমাদের কি করা উচিত ও কি করা উচিত না ইত্যাদি। এ বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সহায়তাকারী কৃষক-কিষাণীদের কাছে জানতে চাইবেন, আমরা রোজ যেসব খাদ্য খাই তা খেয়ে কি আমাদের কোনো অসুবিধা বা সমস্যা হয়? আমরা কি যা খাই তা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ মনে করি? সচরাচর নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণে আমরা যেসব সাধারণ ভুলগুলো করি সহায়তাকারী তা তুলে ধরবেন এবং কি করা উচিত ও কি করা উচিত না তা বুঝিয়ে বলবেন।

## সেশন সহায়িকা

### ভূমিকা

সুস্থভাবে বাঁচতে না পারলে জগতের কিছুই ভালো লাগে না, অশান্তিতে জীবনটা বিষিয়ে ওঠে। আমাদের অধিকাংশ খাদ্য অনিরাপদ যা খেলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে। আমাদের সনাতন খাদ্যাভ্যাস ও বিশৃঙ্খল জীবন যাপন রোগ ও দুর্ভোগ ডেকে আনছে। তাই সুস্থ থাকার জন্য আমাদের অবশ্যই নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও গ্রহণ করা উচিত। তবে খাদ্য শুধু নিরাপদ হলেই হবে না, তা হতে হবে পুষ্টিকরও। তাহলেই আমরা সুস্থ-সবল থাকব।

### নিরাপদ খাদ্য (Safe food)

এক কথায় নিরাপদ খাদ্য হলো সেই খাদ্য যা খেলে আমাদের কোনো স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকে না বা যে খাদ্য স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ। নিরাপদ খাদ্য হলো সেই খাদ্য যা সঠিক নিয়মে,পরিষ্কার ও নিরাপদভাবে সংগ্রহ, পুষ্টিমান অক্ষুণ্ন রেখে প্রক্রিয়াজাত, সংরক্ষণ করা হয় এবং খাদ্যে রোগজীবাণুর উপস্থিতির ঝুঁকি থাকে না বা কম থাকে। উৎপাদন থেকে শুরু করে খাওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ধাপে খাদ্য নিরাপদ ও পরিষ্কার রাখা উচিত। নিরাপদ খাবার খাওয়া এবং সুস্থ্য থাকার জন্য নিচের কতিপয় অনুসরণীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা দরকার।

### খাদ্য নিরাপদতা (Food safety)

খাদ্য নিরাপদতা হল এক বা একাধিক পদক্ষেপ যা ভোক্তার স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য খাদ্যকে খাদ্যের বিভিন্ন বিপত্তি থেকে রক্ষা করে। খাদ্যকে দূষিত করতে পারে তথা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক খাদ্যস্থিত যে কোন কিছুকে খাদ্যবিপত্তি বলা হয়। খাদ্য সংশ্লিষ্ট বিপত্তি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে খাদ্য ব্যবসার সাথে জড়িত খাদ্যকর্মীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ দূষিত খাবার খেয়ে রোগাক্রান্ত হচ্ছে এবং যাদের অনেকেই গুরুতর অসুস্থ হচ্ছে। কেউ কেউ আবার সারা জীবনের জন্য রোগাক্রান্ত হচ্ছে এবং বংশ পরম্পরায় আক্রান্ত হচ্ছে। খাদ্যবাহিত রোগে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী মহিলা এবং যারা আগে থেকেই অন্য কোন কারণে অসুস্থ।

### খাদ্য নিরাপদ রাখার উপায়

* খাদ্য গ্রহণের পূর্বে সঠিক পদ্ধতিতে হাত ধুয়ে নিতে হবে;
* খাদ্য গ্রহণ করতে হবে নিয়মিত ও পরিমিত।
* খাদ্য হতে হবে নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ও ভালভাবে রান্না করা।
* কাঁচা দুধ বা কাঁচা ডিম খাওয়া নিরাপদ নয়, কারণ তাতে রোগজীবাণু থাকে;
* রান্না করা খাবার ২ ঘন্টার বেশি রেখে দেয়া হলে খাবার আগে ভালভাবে গরম করে নিতে হবে।
* খাদ্য গ্রহণ করতে হবে সঠিক পরিমাণে;

* বাসি-পচা, ছত্রাক বা ফাঙ্গাস পড়া বা দুর্গন্ধযুক্ত খাবার খাওয়া যাবে না। তা খেলে পেটের অসুখ দেখা দিতে পারে।
* মাছি পরা খাবার খেলে ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগ হতে পারে; তাই খাবার সব সময় ঢেকে রাখতে হবে;
* বিভিন্ন খাবার বা মিষ্টি জাতীয় খাবারে রং মেশানো যাবে না। বিভিন্ন খাবারে যে সব রং ব্যবহার করা হয়, সেগুলো যদি রাসায়নিক বা কাপড়ের রং হয় তাহলে ক্যান্সার ও কিডনী রোগ দেখা দিতে পারে। এমনকি কৃত্রিম রং ব্যবহৃত খাদ্য বাজার থেকে কিনে খাওয়া উচিত হবে না;
* টমেটো, মটরশুঁটি, পাকা কলা, মাছ ও বিভিন্ন খাদ্যকে সতেজ বা পাকা করার জন্য যেসব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় (যেমন: কার্বাইড ও ফরমালিন) তা থেকে ক্যান্সারসহ বহুরকম রোগ হতে পারে। তাই স্বাভাবিক পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক উপায়ে পাকানো ফল খাওয়া উচিত;
* বাজার থেকে কেনা শাকসবজি ও ফলে অনেক সময় বালাইনাশকের দূষণ থাকে। তাই সেগুলো খাওয়ার আগে কিছুক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রেখে ভালোভাবে ধুয়ে খাওয়া উচিত;
* বিভিন্নবস্তু দ্বারা খাদ্য দূষণ হয়, যেমন- চুল, ভাঙা কাঁচ, ধুলাবালি, আবর্জনা, তেলাপোকা, ইত্যাদি। খাদ্য যাতে দুষিত না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে ও দূষিত খাদ্য খাওয়া যাবে না;
* বিশেষ বিশেষ খাদ্যের প্রতি কারো কারো অ্যালার্জি থাকে। যেমন- চীনাবাদাম, তিলবীজ, চিংড়ি, কাঁকড়া, বেগুন ইত্যাদি। যে খাদ্যের প্রতি অ্যালার্জি থাকে তা খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

# সেশন ২১ মাসিক সভা, সঞ্চয়, ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনা ও অন্যান্য সাংগঠনিক কাজ

**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

অংশগ্রহণকারীরা একটি ত্রিপলের উপর ইংরেজী 'ইউ' অক্ষর করে বসবেন। সহায়তাকারী কুশল বিনিময় করে সেশন সূত্রপাত করবেন এবং সেশনের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে বলবেন। ভূমিকায় ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টার সম্পর্কে বলবেন। সকলের সাথে আলোচনার মাধ্যমে মাসিক চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ করবেন এবং এই সঞ্চয় কিভাবে ব্যবহার হতে পারে তা নিয়ে সদস্যদের মতামত শুনবেন। কিভাবে ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারের জন্য ব্যাংক একাউন্ট খুলতে ও পরিচালনা করতে হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। সেন্টারের আয়-ব্যয় এর হিসাব রক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করবেন। সার্ভিস সেন্টারের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রেজিস্টার যেমন চাঁদা আদায় রেজিস্টার, সভার কার্যবিবরণী রেজিস্টার, বাৎসরিক পরিকল্পনা রেজিস্টার, আয়-ব্যয় রেজিস্টার ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবেন। অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কেও আলোচনা করবেন।

## সেশন সহায়িকা

### ভূমিকা

ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টার (এফএসসি) হচ্ছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তালিকাভূক্ত এমন একটি কৃষক গ্রুপ যারা আগ্রহী কৃষকদেরকে ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি, কৃষি উপকরণ সংগ্রহ, কৃষি যন্ত্র ব্যবহার এবং বিক্রয় সম্পর্কিত সেবা নির্দিষ্ট সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে প্রদান করবেন ও উদ্যোক্তা হিসেবে কৃষি ব্যবসায় পরিচালনা করবেন। সাধারণত যেখানে যেখানে যে ফসল ক্লাস্টার বা গুচ্ছাকারে উৎপাদিত হয় সেখানে সেই ফসলটির জন্য ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টার স্থাপিত ও উদ্যোক্তা তৈরি হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রাথমিক অবস্থায় পার্টনার প্রোগ্রামের মাধ্যমে পার্টনার ফিল্ড স্কুল (পিএফএস) পরিচালিত হচ্ছে। পার্টনারের প্রত্যাশা, ফিল্ড স্কুল সমাপ্ত হওয়ার পর সেগুলো ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারে রূপান্তরিত হবে। এই সেন্টারের কার্যনির্বাহী কমিটি হবে ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট। পিএফএস সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে পিএফএস-এর সদস্যরা আলোচনা বা সরাসরি ভোটাভুটির মাধ্যমে ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করবেন। কমিটিতে অবশ্যই দুইজন নারী সদস্য অন্তর্ভূক্ত থাকবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির প্রকৃতি হবে অরাজনৈতিক। এই কমিটিতে একজন করে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি, ক্যাশিয়ার ও পাঁচ জন সদস্য থাকবেন। সদস্যদের মধ্যে অন্তত ২ জন নারী সদস্য থাকবেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের স্থানীয় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টার গঠনে সাহায্য করবেন, কার্যক্রম তদারক করবেন ও সভায় উপস্থিত থাকবেন।

### মাসিক সভা

কার্যনির্বাহী কমিটির সভা প্রতি মাসে একটি করে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে একটি দিন বা বার নির্দিষ্ট করা থাকলে সদস্যদের তা মনে রাখতে সুবিধা হয়। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি যে কোন সময় সভা আহবান করতে পারবেন। প্রতি ৬ বা ১২ মাসে সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে একটি করে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। কার্যনির্বাহী কমিটি ও সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য নূন্যতম ৭০% সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন।

### মাসিক সঞ্চয়

ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারের আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে ও সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় অর্থের প্রয়োজন। সেজন্য সদস্যরা একটি নির্দিষ্ট হারে মাসিক সঞ্চয় করবেন। মাসিক সভার দিন তাঁরা এই সঞ্চয়ের টাকা ক্যাশিয়ারের কাছে প্রদান করবেন। ক্যাশিয়ার তা সঞ্চয় রেজিস্টারে লিখে রাখবেন ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দেবেন। সদস্যরা চাইলে একটি সঞ্চয় পাশ বই তৈরি করে সেখানেও নিয়মিত সঞ্চয়ের টাকা লিখে রাখতে পারেন। এটি ভবিষ্যতে হিসাব সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে সাহায্য করতে পারে।

### ব্যাংক হিসাব

ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারের সদস্যদের মাসিক চাঁদা, আয়, অনুদান, সহায়তা ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত অর্থ কারো হাতে নগদ না রেখে অবশ্যই

তা একটি ব্যাংক হিসাবে জমা রাখা উত্তম। সেজন্য পিএফএস চলাকালীন সময়ের মধ্যে ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারের নামে যে কোনো তফশিলী ব্যাংকে একটি হিসাব খুলতে হবে। এ সময়ে সহায়তাকারী ও উপজেলা কৃষি অফিস সহায়তা করতে পারবেন। তবে ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেমন গঠনতন্ত্র, প্রথম সভার কার্যবিবরণী, হিসাব পরিচালনাকারীদের জাতীয় পরিচয় পত্র, ছবি ইত্যাদি প্রস্তুত রাখতে হবে। চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি এবং কোষাধ্যক্ষ- এই তিন জনের যে কোন দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টার অথবা পার্টনার ফিল্ড স্কুলের নামে একটি ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে। প্রতি বছরের শুরুর সাধারণ সভায় বিগত বছরের আয়-ব্যয়, ব্যাংক হিসাব সহ যাবতীয় আর্থিক তথ্য সাধারণ সদস্যদের সামনে কোষাধ্যক্ষ উপস্থাপন করবেন। একই সভায় সমিতির অতীত কর্মকান্ড এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিষয়াদি তুলে ধরবেন সেক্রেটারী। সেন্টারের আয়-ব্যয়ের অবস্থা বিবেচনা করে সাধারণ সদস্যদের কোন লভ্যাংশ কত দেওয়া প্রপ্য হবেন তা পূর্বেই ক্যাশিয়ার হিসাব কওে রাখবেন। তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় তা উপস্থাপন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাবেন এবং লাভ-লোকসানের বিষয়টি চেয়ারম্যান সভাকে অবহিত করবেন। সাধারণ সভায় সাধারণ সদস্যরা ফসল উৎপাদন, আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডসহ সার্বিক যে কোন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন।

**অন্যান্য কার্যক্রম**

* কার্যনির্বাহী কমিটি নিয়মিত মিটিং করতে সচেষ্ট থাকবেন। আয়বর্ধনমূলক কাজের পাশাপাশি সদস্যদের ভেতর আন্তসম্পর্ক উন্নয়ন করার জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি পহেলা বৈশাখ, নবান্ন, ঈদ পুনর্মিলনীসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবসে স্বল্প পরিসরে বিনোদনমূলক কর্মকান্ড, বৃক্ষরোপণ, খেলাধূলা সহ এলাকা উপযোগী অনুষ্ঠান আয়োজন করবেন।
* ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রাখবেন। কমিটির চেয়ারম্যান সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয় করবেন এবং গ্রুপকে মবিলাইজ করা সহ গ্রুপের যাবতীয় কাজে নেতৃত্ব প্রদান করবেন।
* কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের প্রযুক্তি ও ঝুঁকি ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারে যুক্ত কৃষকদেরকে নিয়মিত অবহিত করবেন। প্রতিটি উৎপাদন মৌসুমের শুরুতেই উপজেলা কৃষি অফিস ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে বাজারের চাহিদা ভিত্তিক টেকসই ফসল উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য উপকরণ বিক্রেতা, কৃষি যন্ত্র বিক্রেতা এবং ফসলের ক্রেতাদের সাথে ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারের যোগাযোগের বিষয়টি উপজেলা কৃষি অফিস সমন্বয় করবে।
* ফার্মাস সার্ভিস সেন্টার প্রয়োজন মনে করলে ফসল উৎপাদনের আগে এবং মৌসুম চলাকালীন সময়ে কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কৃষি রপ্তানিকারকদেরকে ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে চাষাবাদ করতে উপজেলা কৃষি অফিস উৎসাহিত করবে।
* ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা সাচিবিক দায়িত্ব পালনে কিভাবে সভার কার্যবিবরণী, চিঠি লিখতে এবং কাগজপত্র সংরক্ষণ করতে হয় সে বিষয়ে সেক্রেটারিকে ধারণা প্রদান করবেন।
* ফার্মার্স সেন্টার ভাড়া প্রদান ও সদস্যদের ব্যবহারের জন্য কোন যন্ত্র ক্রয় করলে তা নির্দিষ্ট কোন সদস্য বা সাধারণ সদস্যের আওতায় রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। সেন্টারের প্রাথমিক সদস্যদের ক্ষেত্রে যন্ত্র ব্যবহারে ভাড়া আদায় করতে হবে তবে তার পরিমাণ উপকারভোগী কৃষকের চেয়ে কম হবে।
* সেন্টারের কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ফার্মার্স সেন্টার নিজ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার/ বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানিয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারেন। পাশাপাশি উপজেলা কৃষি অফিস সহ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থায় আয়োজিত উপযোগী প্রশিক্ষণে যেন তারা অংশগ্রহণের সুযোগ পান সে বিষয়ে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় সমন্বয় করবেন।

## সেশন ২২ ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টার কী? এ থেকে কীভাবে কৃষকরা সহায়তা পেতে পারে ও পিএফএস কৃষকদের আয়বর্ধনমূলক কাজ কী কী হতে পারে, ভবিষ্যত পরিকল্পনা

**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

পিএফএস কৃষকরা কীভাবে তাদের গ্রুপকে কৃষক সেবা কেন্দ্রে রূপান্তরিত করতে পারে, তার মাধ্যমে তারা কীভাবে লাভবান/উপকৃত হতে পারে, নানারকম আয়বর্ধনমূলক কাজে কীভাবে জড়িত হতে পারেন ও পিএফএস কমিটি তাতে কীভাবে সহায়তা করতে পারে সে সম্পর্কে সহায়তাকারী আলোচনা করবেন। আলোচনা শুরুর আগে তাঁরা যাতে একত্রিত ও সংগঠিত হয়ে একটি সংগঠনে রূপান্তরিত হতে পারে, সেজন্য তাঁদের 'এক বৃদ্ধ ও তাঁর চার ঝগড়াটে পুত্র' নাটিকার মাধ্যমে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ নাটিকার মাধ্যমে সহায়তাকারী 'একতাই শক্তি' বার্তাটি তুলে ধরবেন। এরপর তাঁদের সাথে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের কাছ থেকে কথা বের করে আনবেন যে তাঁরা কী করবেন, কীভাবে করবেন, করলে কী লাভ হবে ইত্যাদি।

### সেশন সহায়িকা

**ভূমিকা**

পার্টনারের প্রত্যাশা প্রতিটি পিএফএস একটি ফর্মারস সার্ভিস সেন্টারে রূপান্তরিত হবে। কৃষক গ্রুপের টেকসই উন্নয়নের জন্যই তা দরকার। এরূপ সেন্টারে প্রশিক্ষিত কৃষকরা একদিকে যেমন নিজেরা নিজেদের টেকসই উন্নতির জন্য নানামুখী কর্মকাণ্ড পরিচালিত করতে পারবে, পাশাপাশি পড়শি কৃষকদেরও নানারকম কৃষিসেবা প্রদান করে সেই সমাজের উপকার করতে পারবে। নিজেদের অতিরিক্ত আয়ের জন্য প্রতিটি ফর্মার্স সার্ভিস সেন্টারকে চাইলে তারা একটি গ্রোথ সেন্টারে পরিণত করতে পারেন, যেখানে তাঁদের নিরাপদ ফসল ও ফসলজাত পণ্য বিশ্বস্ততার সাথে বিপণন করে পারিবারিক আয় বাড়াতে পারেন। এমনকি এর মাধ্যমে যুব ও নারী উদ্যোক্তাও সৃষ্টি হতে পারে। আগ্রহী হলে তাঁদের মাধ্যমে পার্টনারের বিভিন্ন উপকরণ ও যন্ত্রসেবা কার্যক্রমও পরিচালিত হতে পারে। দলগতভাবে তাঁরা কৃষিযন্ত্র সংগ্রহ করে তা সমবায় ভিত্তিতে ব্যবহার করে খামার কাজে লাভবান হতে পারেন। এসব কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য তাঁদের মধ্য থেকে নেতৃত্বের বিকাশ লাভ ঘটবে ও তাঁরা সমাজে আরও বেশি মর্যাদার অধিকারী হবেন।

**ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টার**

প্রাথমিকভাবে ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টার হবে পিএফএস কৃষক-কিষানিদের দ্বারা গঠিত একটি অনানুষ্ঠানিক সংগঠন যা তাদের গোষ্ঠীস্বার্থে কাজ করবে। সাধারণত পিএফএস প্রশিক্ষণ শেষ হলে সে দলের সাথে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংযোগ কমে যায় বা থাকে না। কিন্তু পিএফএস প্রশিক্ষণ চলাকালে যদি তাঁরা সংগঠিত হতে পারে ও নিজেদের পিএফএসকে একটি ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারে রূপান্তরিত করতে পারে, তাহলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে তাঁদের যোগাযোগে স্থায়ী হবে ও অধিকতর সেবা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ভবিষ্যতে এর মাধ্যমে সমন্বিত সম্প্রসারণ সেবা নিশ্চিত হবে।

**ফার্মারস সার্ভিস সেন্টারের উদ্দেশ্য**

* সকল ধরনের কৃষিপ্রযুক্তি বিস্তারের প্ল্যাটফরম হিসেবে ব্যবহার করে পড়শি কৃষকদের মাঝে সেসব প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ঘটানো
* উচ্চমূল্যের পুষ্টিকর ফসল চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা
* লাভজনকভাবে পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য একটি লাগসই ভ্যালু চেইন ও বাজার সংযোগ তৈরি করা। ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টার গ্রুপের কৃষকরা যাতে যৌথ চাষাবাদ ও পণ্য একত্রীকরণের মাধ্যমে যৌথ বিপণনের দ্বারা লাভবান হতে পারেন, সে ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শ সেবা প্রদান ও সহযোগিতা করা
* প্রশিক্ষিত পিএফএস কৃষকদের সংগঠনে রূপান্তরিত করে কৃষকদের ক্ষমতায়ন করা
* সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা ও সেবাদানকারী সংস্থা বা ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ সৃষ্টি করা
* কৃষি উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী তৈরি করা
* সদস্যদের আয়, সাংগঠনিক দক্ষতা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা।

* FSC এর মাধ্যমে ভর্তুকি মূল্যে দলীয়ভাবে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে যান্ত্রিককরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা।

**ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টার পরিচালনার নীতিমালা**

১। প্রতিটি ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টার একটি ৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির দ্বারা পরিচালিত হবে।

২। এ সংগঠনের একটি সংক্ষিপ্ত ও সহজ গঠনতন্ত্র থাকবে।

৩। সদস্যরা নিয়মিত সঞ্চয় করবেন ও তা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা রাখা হবে। প্রয়োজনে সভায় আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করা যাবে।

৪। মাসে একটি সভা করতে হবে। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে (৫ তারিখের মধ্যে সুবিধাজনক কোনো বার ও সময়ে) সভার একটি দিন স্থির করে সভা আহ্বান করা যেতে পারে। অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপসহকারী কৃষি অফিসারের উপস্থিতিতে সভা আয়োজন করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী লিখে রাখতে হবে।

৫। উপজেলা কৃষি অফিসার/অতিরিক্ত কৃষি অফিসার/কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারের কার্যক্রম পরিদর্শন ও মনিটরিং করবেন।

৬। ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারের একটি বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা থাকবে।

৭। সংগঠন চাইলে সমবায় অধিদপ্তরে যাবতীয় নিয়মকানুন মেনে নিবন্ধন করতে পারে।

ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (বছর ----------)

| কার্যক্রম | উদ্দেশ্য/কারণ কী? (পরিবেশ উন্নয়ন/ সামাজিক সুরক্ষা সেবা/ উদ্যোক্তা ও কৃষি ব্যবসা/ আয়বৃদ্ধি ইত্যাদি) | পরিমাণ (কতটুকু/ কয়টি করা হবে?) | বাজেট (টাকা) | কখন করা হবে? (মাস ও বছর) | কোথায় করা হবে? (স্থান) | কে বা কারা করবেন? (কার্যক্রম বাস্তবায়নকারীবৃন্দ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**মাসিক সঞ্চয়**

ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারের প্রত্যেক সদস্য মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিজেরা সঞ্চয় করবেন। এই অর্থ তাঁরা নিজেরা নিজেদের প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন। সভার সিদ্ধান্ত ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষি ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারবেন ও আনুপাতিক হারে তার লভ্যাংশপ্রাপ্ত হবেন।

**সভা পরিচালনা**

মাসে একটি সভা আয়োজন করতে হবে। নিয়মিত সভা করলে সংগঠনে গতিশীলতা বজায় থাকবে, সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। সভা আহ্বানের জন্য একটি নোটিশ করতে হবে। নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে সভা আয়োজন করতে হবে। একজন সভাপতিত্ব করবেন। সভায় যাঁরা উপস্থিত থাকবেন, তাঁরা হাজিরায় স্বাক্ষর দেবেন। ধারাবাহিকভাবে আলোচ্য সূচি অনুযায়ী সভা পরিচালিত হবে। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত লিখতে হবে (পিএফএস রেজিস্টারে ছক দেখা যেতে পারে)। সভা শেষে সভার সারাংশ সবাইকে জানিয়ে সভাপতি কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করবেন।

# সেশন ২৩ কৃষকদের ধানখেতের বর্তমান পোকা ব্যবস্থাপনা

**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

সহায়তাকারী কৃষকদের মাঠে ঘুরে দেখবেন বা কৃষকদের প্রশ্ন করে জেনে নেবেন যে, সে সময় মাঠে কী কী বালাইয়ের উপদ্রব তাঁরা সবচেয়ে বেশি দেখছেন। এটা কি পোকা? রোগ না অন্য কিছু? এর ভিত্তিতে বর্তমান কোন বালাই সম্পর্কে আলোচনা করবেন তা নির্ধারণ করবেন। ঐ সময়ে ধানখেতে যে বালাইয়ের উপদ্রব সবচেয়ে বেশি দেখা যাবে, এই সেশনে সেই বালাইয়ের চেহারা, ক্ষতির নমুনা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে জীবন্ত নমুনা সহ আলোচনা করবেন। অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ও জীবন্ত নমুনা (বালাই ও তাঁর ক্ষতির লক্ষণ) প্রদর্শনের মাধ্যমে সেশন পরিচালনা করবেন। এভাবে ভবিষ্যতে কৃষকরা তাদের ধানের খেতে যখন যে বালাইয়ের উপদ্রব দেখবেন, তখন তা নিয়ন্ত্রণের জন্য আইপিএম পদ্ধতিতে ধারাবাহিকভাবে কী কী কাজ করবেন তা উপসংহারে বলবেন। অনুশীলনের জন্য ধানখেতে সাধারণত যেসব পোকার আক্রমণ বেশি দেখা যায়, সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করা হলো।

## সেশন সহায়িকা

### ১. মাজরা পোকা ব্যবস্থাপনা

- ডাল পুঁতে পোকাখেকো পাখি বসার ব্যবস্থা করা
- ডিমের গাদা সংগ্রহ করে বাঁশের বুস্টারে লালন (বোলতা ছাড়া ক্ষতিকর পোকার কীড়া বের হলে বাঁশের অন্ধকূপে মারা যাবে। বোলতা বের হলে বাঁশের ছিদ্রপথে বেরিয়ে যাবে।)
- হাতজাল দ্বারা পূর্ণবয়স্ক পোকা/মথ দমন
- আলোক ফাঁদ ব্যবহার করে পূর্ণবয়স্ক পোকা/মথ দমন
- ধানখেতে মাছ চাষ করে পানিতে পড়া পূর্ণবয়স্ক পোকা/কীড়া দমনের ব্যবস্থা করা
- বন্ধু পোকা সংরক্ষণ করা (আইল ফসল চাষ, বাঁশের বুস্টারে, পলিব্যাগে ইত্যাদি )

### ২. পামরি পোকা ব্যবস্থাপনা

- সপ্তাহে অন্তত একবার জরিপ করা
- ডিম/বাচ্চা/পূর্ণাঙ্গ পোকামুক্ত চারা রোপণ
- পূর্ণাঙ্গ পোকা দেখা গেলে হাতজাল ব্যবহার
- পামরির বাচ্চাযুক্ত পাতা কর্তন(পাতার নিচের দিক থেকে ২-৩ ইঞ্চি রেখে উপরের দিক থেকে ডিম ও কীড়া আক্রান্ত অংশ কর্তন ও অপসারণ)
- বিকল্প পোষক (দল, আড়ালি ঘাস) ধ্বংস করা
- মুড়ি ফসল নষ্ট করা
- সমকালীন চাষাবাদ করা এবং সকল কৃষক উপর্যুক্ত বিষয়গুলো একত্রে পালন করা

### ৩. গান্ধি পোকা ব্যবস্থাপনা

- সমকালীন চাষাবাদ করা
- বিকল্প পোষক ধ্বংস করা
- বন্ধু পোকা সংরক্ষণ করা
- আলোক ফাঁদ ব্যবহার করে পূর্ণবয়স্ক পোকা দমন

**৪. নলি মাছি ব্যবস্থাপনা**

- নিয়মিত জরিপ করা
- আলোক ফাঁদ ব্যবহার করে পূর্ণবয়স্ক পোকা/মথ দমন
- বিকল্প পোষক (আগাছা) ধ্বংস করা
- ইউরিয়া সারের পরিমিত ব্যবহার

**৫. বাদামি গাছফড়িং ব্যবস্থাপনা**

- বালাই সহনশীল জাতের চাষ
- নিয়মিত জরিপ করে পোকার উপস্থিতি নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণ
- বীজতলায় হাতজাল ব্যবহার করে পূর্ণবয়স্ক পোকা দমন
- নির্দিষ্ট দূরত্বে লাইনে চারা রোপণ
- ইউরিয়া সারের পরিমিত ব্যবহার
- আক্রমণ দেখামাত্র জমি থেকে পানি সরিয়ে ফেলা
- আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা
- থোড় আসার আগপর্যন্ত হাঁসের বাচ্চা ছেড়ে দেওয়া
- আলোক ফাঁদ ব্যবহার করে বীজতলায় উপস্থিতি নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণ
- এলোপাতাড়ি কীটনাশক ব্যবহার রোধ করা

**৬. শীষকাটা লেদা পোকা ব্যবস্থাপনা**

- জমিতে সেচ দেওয়া
- আলোক ফাঁদ ব্যবহার করে পূর্ণবয়স্ক পোকা/মথ দমন
- ডাল পুঁতে পোকাখেকো পাখি বসার ব্যবস্থা করা
- খড়/নাড়া পুড়িয়ে ফেলা অথবা জমি চাষ দিয়ে ফেলে রাখা
- আধাপাকা বা পাকা ধান হেলিয়ে দেওয়া

**৭. চুঙ্গি পোকা ব্যবস্থাপনা**

- আক্রমণ দেখামাত্র জমি থেকে পানি সরিয়ে ফেলা
- ডাল পুঁতে পোকাখেকো পাখি বসার ব্যবস্থা করা
- আলোক ফাঁদ ব্যবহার করে পূর্ণবয়স্ক পোকা/মথ দমন
- হাতজাল ব্যবহার করে পূর্ণবয়স্ক পোকা/মথ দমন

**৮. পাতা মোড়ানো পোকা ব্যবস্থাপনা**

- হাতজাল ব্যবহার করে পূর্ণবয়স্ক পোকা/মথ দমন
- আলোক ফাঁদ ব্যবহার করে পূর্ণবয়স্ক পোকা/মথ দমন
- এলোপাতাড়ি কীটনাশক ব্যবহার রোধ করা এবং বন্ধু পোকা সংরক্ষণ করা

**৯. থ্রিপস পোকা ব্যবস্থাপনা**

- বীজতলা পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া
- ইউরিয়া দ্রবণ পাতায় স্প্রে করা
- পানিতে ভিজিয়ে সাদা কাপড় টানা
- জৈব বালাইনাশক (ট্রেসার/সাকসেস) স্প্রে করা

# সেশন ২৪ জৈব বালাইনাশক পরিচিতি, তৈরি ও ব্যবহার কৌশল

**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

সহায়তাকারী কৃষকদের মাঠে ঘুরে দেখবেন বা কৃষকদের প্রশ্ন করে জেনে নেবেন যে, সে সময় মাঠে কী কী বালাইয়ের উপদ্রব তাঁরা সবচেয়ে বেশি দেখছেন। এটা কি পোকা? রোগ না অন্য কিছু? এর ভিত্তিতে বর্তমান কোন বালাই সম্পর্কে আলোচনা করবেন তা নির্ধারণ করবেন। ঐ সময়ে ধানখেতে যে বালাইয়ের উপদ্রব সবচেয়ে বেশি দেখা যাবে, এই সেশনে সেই বালাইয়ের চেহারা, ক্ষতির নমুনা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে জীবন্ত নমুনা সহ আলোচনা করবেন। অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ও জীবন্ত নমুনা (বালাই ও তাঁর ক্ষতির লক্ষণ) প্রদর্শনের মাধ্যমে সেশন পরিচালনা করবেন। এভাবে ভবিষ্যতে কৃষকরা তাদের ধানের খেতে যখন যে বালাইয়ের উপদ্রব দেখবেন, তখন তা নিয়ন্ত্রণের জন্য আইপিএম পদ্ধতিতে ধারাবাহিকভাবে কী কী কাজ করবেন তা উপসংহারে বলবেন। অনুশীলনের জন্য ধানখেতে সাধারণত যেসব পোকার আক্রমণ বেশি দেখা যায়, সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করা হলো।

## সেশন সহায়িকা

### ভূমিকা

রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহারে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে। তাই বিশ্বব্যাপী এখন জৈব বালাইনাশকের ব্যবহার বাড়ছে, বিশেষ করে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে। দুই ধরনের জৈব বালাইনাশক রয়েছে। কারখানায় প্রস্তুত কৃত্রিম জৈব বালাইনাশক ও ঘরে প্রস্তুত ভেষজ বালাইনাশক। এ দেশে বর্তমানে ৭৭টি জৈব বালাইনাশক বাজারজাতকরণে সরকার অনুমোদন দিয়েছে। কিন্তু ঘরোয়া পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা যায় এরূপ জৈব বালাইনাশকের কোনো অনুমোদন নেই। তবে এরূপ জৈব বালাইনাশক পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ, সস্তা ও সহজে ব্যবহার করা যায় বিধায় পিএফএস-এর কৃষক-কিষানিরা এসব জৈব বালাইনাশক তৈরি করে ব্যবহার করতে পারেন। তা না পারলে বাজার থেকে জৈব বালাইনাশক কিনে তা প্রয়োগ করতে পারেন।

### জৈব বালাইনাশকের সুফল

* জৈব বালাইনাশক পরিবেশের কোনো ক্ষতি করে না।
* জৈব বালাইনাশক এর প্রভাবে ক্ষতিকর পোকার বৃদ্ধি ব্যাহত হলেও উপকারী পোকামাকড়ের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই।
* মাটির অণুজীব ও কেঁচোর ওপর কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।
* জমিতে স্প্রে করার সাথে সাথে ফসল তোলা ও ব্যবহার করা যায়।
* জৈব বালাইনাশকের কোনো দীর্ঘমেয়াদি অবশিষ্টাংশ বিদ্যমান থাকে না বলে পরিবেশের জন্য নিরাপদ।

### ভেষজ বালাইনাশক

জৈব উৎস বিশেষ করে উদ্ভিদ/উদ্ভিদাংশ থেকে উৎপন্ন বালাইনাশককে ভেষজ জৈব বালাইনাশক বলে। আমাদের দেশ আয়তনে ছোট হলেও উদ্ভিদ বৈচিত্র্যে খুবই সমৃদ্ধ। আবহমান কাল থেকেই মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় গাছগাছালি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এমনকি কৃষি ফসল উৎপাদনের ও সংরক্ষণেও গাছগাছড়ার ব্যবহার ঐতিহ্য সুদীর্ঘ কালের।

### কিছু ভেষজ বালাইনাশক তৈরি ও ব্যবহারের পদ্ধতি

১. নিমের পাতা, ছাল ও কাপড় কাচা সাবান দ্বারা: দুই কেজি নিমের পাতা, ১.৫ কেজি নিমের ছাল শিল পাটায় একটু থ্যাঁতলে নিন। থ্যাঁতলানো পাতা, ছাল এবং ৫০ গ্রাম গুঁড়া সাবান একটি পাত্রে দিয়ে ৫ লিটার পানি মিশ্রিত করুন। জ্বাল দিয়ে ৫ লিটার পানিকে কমিয়ে ১ লিটার বানিয়ে ঠান্ডা করে ছেঁকে নিন। ৯ লিটার পানি যোগ করে স্প্রে করুন। এতে সকল প্রকার মাছি পোকা, বিটল জাতীয় পোকা, কীড়া ও বিছা পোকা দমন করা যায়।

২. নিম পাতার গুঁড়া দ্বারা: নিম পাতা ছায়ায় বিছিয়ে এক সপ্তাহ শুকাতে হবে। শুকনা পাতা ভালো করে গুঁড়া করতে হবে। প্রতি ৫০ কেজি বীজ সংরক্ষণের জন্য ১ কেজি গুঁড়া মিশাতে হবে। সংরক্ষণের মেয়াদ বাড়াতে হলে সমপরিমাণ ধুতরা পাতার গুঁড়া একই রকম মিশাতে হবে। এতে গুদামজাত ফসলের পোকা দমন হয়।

৩. নিম বীজ দ্বারা: এক কেজি নিম বীজ ছায়ায় শুকিয়ে খোসা ছড়িয়ে নিন। বীজ পিসে মলমের মতো তৈরি করুন। এর সাথে ৭৫ গ্রাম গুঁড়া সাবান মিশান। মিশ্রণটি ১০০ লিটার পানি মিশালে ২% দ্রবণ তৈরি হবে। দ্রবণ এক রাত রেখে দিন। এরপর ৭০-৮০ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ২/৩ ঘণ্টা ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে ছেঁকে জমিতে ব্যবহার করুন। এতে পাতা মোড়ানো পোকাসহ বিভিন্ন ধরনের কীড়া ও গান্ধি পোকা দমন করা যায়। এটা কৃমিনাশকের কাজ করে।

৪. মেহগনি বীজ: ৮-১০টি কাচা ফলের সাদা অংশ কুচি কুচি করে কেটে ৭ দিন ভিজিয়ে রেখে ছেকে ৫০ গ্রাম কাপড় পরিষ্কার করা পাউডার মিশিয়ে স্প্রে করুন। বাদামি গাছফড়িং, মাজরা, পাতা মোড়ানো ও ডায়মন্ড ব্যাক মথ দমন করা যায়।

৫. তামাক পাতা দ্বারা: এক কেজি কাচা তামাক পাতা ১০ লিটার পানিতে সারা রাত ভিজিয়ে রেখে কচলিয়ে নিন। ছেঁকে ব্যবহার করুন অথবা বড় আকারের ১০টি শুকনা পাতা ১০ লিটার পানিতে সারা রাত ভিজিয়ে ছেঁকে ব্যবহার করুন। মাইট ও জ্যাসিড দমন করা যায়।

৬. বিষকাটালি ও ঢোল কলমি দ্বারা: বিষকাটালি বা ঢোল কলমির পাতা, কাণ্ড (পেষানো) ১ কেজি, ১০ লিটার পানিতে ভিজিয়ে ঢেকে স্প্রে করুন। এতে জাবপোকা, মাছি, পাতা ও ফলখেকো কীড়া দমন করা যায়।

৭. টমেটো গাছ দ্বারা : এক কেজি কাণ্ড ও পাতা ৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫-২০ মিনিট জ্বাল দিন। ছেঁকে নিয়ে স্প্রে করুন। এতে কাণ্ড পাতার শোষক পোকা লার্ভা দমন হয়।

৮. কালো কচুর পাতা দ্বারা: এক কেজি কালো কচুর পাতা ৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩০ মিনিট সিদ্ধ করুন। ঠান্ডা করে ছেঁকে ব্যবহার করুন। এতে কীড়া, বাদামি গাছফড়িং, পাতা শোষক পোকা দমন হয়।

৯. আতা ও শরিফার পাতা দ্বারা: এক কেজি পাতা পিষানো (বাটা) ১০ লিটার পানিতে গুলিয়ে ছেঁকে স্প্রে করুন। এতে কুমড়ার পোকা, ডায়মন্ড ব্যাক মথা, জাবপোকা, জ্যাসিড দমন করা যায়।

১০. শুকনা মরিচের গুঁড়া দ্বারা: ১০০ গ্রাম শুকনা মরিচের গুঁড়া ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভিজিয়ে রাখুন। এক ৫০ গ্রাম গুঁড়া সাবান মিশিয়ে ৫ লিটার পানি যোগ করুন এবং ছেঁকে স্প্রে করুন। এতে শসার মোজেইক ভাইরাস রোগের বাহক, পিঁপড়া, জাবপোকা দমন হয়।

১১. পাট বীজের দ্বারা: এক কেজি বীজ আস্তে আস্তে কড়াইতে ভেজে নিন। ভাজা বীজ পিষে নিন এবং ৬০ লিটার পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। ছেঁকে নিয়ে ১ বিঘা জমিতে স্প্রে করুন। এতে মাজরা, বাগ, পাতা শোষক পোকা দমন করা যায়।

১২. পিঁয়াজ: ২০ মিলিলিটার রস ২ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন। এতে ঢলে পড়া রোগ দমন হয়।

১৩. নিশিন্দা পাতা: দুই কেজি নিশিন্দা পাতা, ১০৫ কেজি নিশিন্দার ছাল শিল পাটায় একটু থেতলে নিন। থ্যাঁতলানো পাতা, ছাল এবং ৫০ গ্রাম গুঁড়া সাবান একটি পাত্রে দিয়ে ৫ লিটার পানি মিশ্রিত করুন। জ্বাল দিয়ে ৫ লিটার পানিতে কমিয়ে ১ লিটার বানিয়ে ঠান্ডা করে ছেঁকে নিন। ৯ লিটার পানি যোগ করে স্প্রে করুন। এতে সকল প্রকার পাতা খেকো, বিছা ও সেমিলুপার দমন হয়।

১৪. ইপিল ইপিল পাতা ও জবা ফুলের রস: ১ কেজি ইপিল ইপিল পাতা ও ১ কেজি জবা ফুলের পাতা বেটে ১০ লিটার পানিতে গুলিয়ে নির্যাস তৈরি করে স্প্রে করতে হবে।

১৫. পেঁপে পাতার নির্যাস: ১ কেজি পেঁপে পাতা কুচি কুচি করে কেটে ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে এবং এক রাত রেখে তাতে ১০ লিটার পানি যোগ করে ছেঁকে নিতে হবে এবং স্প্রে করতে হবে। এতে পাউডারি মিলডিউ রোগ নিরাময় হয়।

**ধানের জন্য জৈব বালাইনাশক**

১. **বায়ো চমক:** ১.৫ থেকে ২.৫ মিলিলিটার বায়ো চমক প্রতি লিটার পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে আক্রমণ স্থলে স্প্রে করতে হবে। এতে বাদামি গাছফড়িং নিয়ন্ত্রণ হবে।

২. **এবাম্যাক্স ৫এমই (এবামেকটিন):** বাদামি গাছফড়িং নিয়ন্ত্রণের জন্য ৪০০ মিলিলিটার/হেক্টর মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

৩. **এবাডা ১.৮এমই (এবামেকটিন):** বাদামি গাছফড়িং নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ১.২ মিলিলিটার হারে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় স্প্রে করতে হবে।

৪. **এবাকন ১.৮এমই (এবামেকটিন):** বাদামি গাছফড়িং নিয়ন্ত্রণের জন্য ১ লিটার/হেক্টর হারে প্রযোগ করতে হবে।

৫. **নিমাজল ১.২ ইসি (অ্যাজাডিরেকটিন):** বাদামি গাছফড়িং নিয়ন্ত্রণের জন্য ২ লিটার/হেক্টও হারে প্রযোগ করতে হবে।

৬. **ট্রেসার ১৭৫এমএল (স্পাইনোসেড):** প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪ মিলিলিটার ট্রেসার মিশিয়ে স্প্রে করে থ্রিপস পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৭. **সাকসেস ৬৫০এমএল (স্পাইনোসেড):** প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১২ মিলিলিটার পরিমাণ সাকসেস মিশিয়ে স্প্রে করে থ্রিপস পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

# সেশন ২৫ ধান কাটা, মাড়াই, ঝাড়াই ও সংগ্রহোত্তর অন্যান্য ব্যবস্থাপনা এবং মজুত

**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

সহায়তাকারী অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ও পদ্ধতিগুলো অনুশীলনের মাধ্যমে অধিবেশন পরিচালনা করতে পারেন।

## সেশন সহায়িকা

### ভূমিকা

মাঠে ধান পরিপক্ব হওয়ার পর থেকে সংরক্ষণ বা মজুত পর্যন্ত কার্যক্রম হলো সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা। ধান উৎপাদনের পর ভালো দাম পেতে ও দীর্ঘদিন মজুত অবস্থায় ধান ভালো রাখতে কাটা থেকে শুরু করে মজুত পর্যন্ত কাজগুলো সঠিকভাবে করা দরকার। বিশেষ করে যেসব খেত থেকে বীজ রাখতে হবে, সেসব খেতে কাটার আগে কয়েক দফায় বিজাত বাছাই ও এসব কাজ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সেশনে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো।

### মাঠে বীজ ধান নির্বাচন ও ধান কাটা

বীজ হিসেবে রাখতে চাইলে এমন খেত থেকে ধানের বীজ নির্বাচন বা সংগ্রহ করতে হবে যে খেতের ধান ভালোভাবে পেকেছে (অন্তত শতকরা ৮০% পরিপক্ব), রোগ ও পোকামুক্ত। জমির মধ্যে সমভাবে পরিপক্ব স্থান থেকে বীজের ধান কাটতে বা সংগ্রহ করতে হবে। পাকা ধান মাঠে ফেলে না রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেটে আনা উচিত। শীষের মাথা থেকে কয়েকটি ধান পরীক্ষা করতে হবে। এজন্য ধানের খোসা ছাড়িয়ে দেখতে হবে। যদি দেখা যায় চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে ধান পেকেছে। চাল নরম ও ঘোলা থাকলে বুঝতে হবে ধান এখনও ভালোভাবে পাকেনি। তবে শীষের ওপরের অংশে শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে এবং শীষের নিচের অংশে শতকরা ২০ ভাগ চাল আংশিক শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান ঠিকভাবে পেকেছে বলে ধরে নেয়া যায়। এ অবস্থায় ধান কেটে ফেলতে হবে।

### ধান মাড়াই

ধান মাড়াইয়ের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গা বেছে নিতে হবে। শুষ্ক ও রৌদ্রজ্জ্বল দিনে ধান মাড়াইয়ের কাজ করা উচিত। ধান কেটে মাঠে বা বাড়ির উঠোনে এনে মাড়াই করা যেতে পারে। আমাদের দেশে প্রচলিত প্রথায় বাড়ির উঠোন বা আঙিনা গোবর দিয়ে লেপে শুকানোর পর সেখানে ধান মাড়াই করা হয়। গরু দিয়ে মাড়াই করার প্রথা এদেশে অনেক দিনের। তাছাড়া ইতোমধ্যে আমাদের দেশে মাড়াই যন্ত্র ও অন্যান্য পদ্ধতির ব্যবহার প্রসার লাভ করেছে। কাঁচা খলায় বা উঠোনে সরাসরি ধান মাড়াই না করে চাটাই, পাটি, পলিথিন ইত্যাদি বিছিয়ে তারপর মাড়াই যন্ত্র বসিয়ে মাড়াই করা ভালো। এভাবে মাড়াই করলে ধানের রং উজ্জ্বল ও পরিষ্কার থাকে। তাছাড়া সম্প্রতি গ্রামেগঞ্জে পাওয়ার থ্রেসারের মাধ্যমে ধান মাড়াই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এতে খুব তাড়াতাড়ি অল্প শ্রমে অনেক ধান মাড়াই করা যায়।

### ধান শুকানো

ধান মাড়াইয়ের পর কমপক্ষে ৪ থেকে ৫ বার ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। কড়া রোদে বা দুপুরে ধান শুকানো ঠিক নয়। এতে চাল ভেঙে যেতে পারে। তবে দুপুরের রোদে ধানের ওপর খড় বিছিয়ে ঢেকে শুকানো যেতে পারে। বাদলা বা বৃষ্টির দিনে ধান শুকানো সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বৃষ্টির পানিতে ধান যাতে না ভিজে, সে ব্যবস্থা নিতে হবে। বাদলা দিন থাকলে শীষ কেটে ছোট ছোট আঁটি বেঁধে ঘরে ঝুলিয়ে রেখে শুকানো যায়। বেশি ধানের ক্ষেত্রে এভাবে ধান শুকানো সম্ভব নয়। বাদলা দিনে কোনো উপায় না থাকলে ধান মাড়াই করে সাধ্যমতো ঝেড়ে বস্তায় ভরে কোনো জলাশয়ে দুই থেকে তিন হাত গভীর পানিতে খুঁটির সাথে বেঁধে ডুবিয়ে রাখা যেতে পারে। তবে লক্ষ রাখতে হবে যেন বস্তাগুলো ডুবন্ত অবস্থায় মাটির সংস্পর্শে না আসে। এভাবে ১০ থেকে ১৫ দিন পর্যন্ত ধান না শুকিয়ে পানিতে ডুবিয়ে রাখা যায়। এতে বীজ গজানোর কোনো ক্ষতি হয় না, তবে পানিতে ডুবিয়ে রাখার ফলে কিছুটা গন্ধ হয়। কিন্তু শুকিয়ে ধান সিদ্ধ করলে চালে আর কোনো গন্ধ থাকে না। সম্প্রতি ব্রি বীজ শুকানোর যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে, যা দিয়ে প্রতি ব্যাচে ১০০-২৫০ কেজি ধান শুকানো

যায়। প্রাথমিক আর্দ্রতার পরিমাণের ওপর নির্ভর করে ১৩-১৪% আদ্রতায় আনতে এ যন্ত্র দ্বারা ধান শুকাতে ৭-৮ ঘণ্টা সময় লাগে। যন্ত্রটি একটি ৩৩০ ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ব্লোয়ার এবং ০.৫ অশ্বশক্তির একটি ইলেকট্রিক মোটর দিয়ে চালানো হয়। প্রতিকূল আবহাওয়ায় বিশেষ করে নিম্নচাপ, বৃষ্টি, মেঘলা দিনে এ যন্ত্রে ধান শুকানো সুবিধাজনক।

**ধান বীজ মজুতের জন্য করণীয়**

* ধান মাড়াইয়ের পর থেকে ৫ থেকে ৬ বার ধান রোদে ভালোভাবে শুকাতে হবে, যেন বীজের আর্দ্রতা শতকরা ১২ ভাগের নিচে থাকে। দাঁত দিয়ে কামড় দিলে যদি কটকট শব্দ করে, তবে বুঝতে হবে যে বীজ ঠিকমতো শুকিয়েছে।
* পুষ্ট ধান বাছাই করতে কুলা দিয়ে অন্তত দুবার ঝেড়ে নেওয়া ভালো।
* বীজ রাখার জন্য বায়ুরোধী পাত্র যেমন- ড্রাম অথবা বিস্কুট বা কেরোসিনের টিন ব্যবহার করা যেতে পারে। বীজ রাখার পূর্বে পাত্র ভালোভাবে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিতে হবে।
* ধাতব বা প্লাস্টিকের ড্রাম পাওয়া না গেলে মাটির মটকা, কলস বা মোটা পলিথিনের থলি বা বস্তা ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে মাটির পাত্র ব্যবহার করলে পাত্রের গায়ে দুবার আলকাতরার প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।
* রোদে শুকানো বীজ অবশ্যই ঠান্ডা করে পাত্রে ভরতে হবে। পাত্রটি সম্পূর্ণ বীজ দিয়ে ভরাট করে রাখতে হবে। বীজের পরিমাণ কম হলে বীজের ওপর কাগজ বিছিয়ে তার ওপর শুকনো বালি দিয়ে পাত্র পরিপূর্ণ করতে হবে। অথবা পাত্রের ভেতরে ফাঁকা জায়গায় প্রদীপ বা মোমবাতি জ্বেলে রেখে মুখ বন্ধ করতে হবে। ফাঁকা জায়গায় যতক্ষণ বাতাস থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাতি জ্বলবে। এভাবে পাত্রটি বায়ুশূন্য করা যায়।
* পাত্রের মুখ ভালোভাবে বন্ধ করতে হবে, যেন বাতাস ঢুকতে না পারে। বীজপাত্র মাচায় রাখতে হবে যেন পাত্রের তলা মাটির সাথে না লাগে।
* গোলায় ধান রাখলে ৪০ কেজি ধানের জন্য আনুমানিক ১২০ গ্রাম শুকনা নিম, নিশিন্দা বা বিষকাটালির পাতা গুঁড়া করে বীজের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এভাবে বীজ সংরক্ষণ করলে পোকার আক্রমণ প্রতিহত হবে।

ধান মাড়াই

# সেশন ২৬ ধানের বাজার সংযোগ তৈরি, মূল্য সংযোজন, বাণিজ্যিকীকরণ ও বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন

**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

সহায়তাকারী অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে পার্টনার প্রবর্তিত ধানের ভ্যালু চেইন সম্পর্কে কৃষকদের ধারণা দেবেন ও তা ব্যবহার করে কৃষকরা কীভাবে লাভবান হতে পারেন, সে সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

## সেশন সহায়িকা

### ভূমিকা

আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিবেশসম্মতভাবে উন্নত মানের ধানবীজ উৎপাদন করতে পারলে পিএফএস তথা ফার্মারস সার্ভিস সেন্টারের সদস্য কৃষকরা তা বিপণনের মাধ্যমে অধিক লাভবান হতে পারবেন। সেজন্য একটি সুসংগঠিত বাজার সংযোগ তৈরি ও বিপণন কার্যক্রম সম্পর্কে কৃষকদের ভালো ধারণা থাকা দরকার। পার্টনার ফিল্ড স্কুলের প্রশিক্ষিত কৃষকরা ব্রিধান ১০০+ ও অন্যান্য প্রিমিয়াম কোয়ালিটি রাইসের জাতের ধান উৎপাদন করবেন যেসব জাতের বীজ সাধারণত এলাকার কৃষকদের কাছে খুব সহজলভ্য না আবার বাজারে চাহিদাও আছে। তাই পিএফএস কৃষকরা তাঁদের নিজেদের জমিতে ভিত্তি বীজ বা প্রত্যয়িত বীজ সংগ্রহ করে আধুনিক বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি অনুসরণ করে কৃষক পর্যায়ে বিশুদ্ধ ধানবীজ উৎপাদন ও বিপণন করতে পারেন। এতে স্থানীয়ভাবে ধানবীজ উৎপাদক গ্রুপ বা ব্যক্তি উদ্যোক্তা তৈরি হবে এবং আধুনিকতম জাতের ধানবীজ এলাকায় সহজলভ্য হবে।

### ধানবীজ উৎপাদন, বাজার সংযোগ ও উদ্যোক্তা তৈরি

ব্যক্তি বা গ্রুপ উদ্যোক্তা হিসেবে ধানবীজ উৎপাদন ও বিপণনের জন্য যেসব কাজ করতে হবে সেগুলো হলো-

* উৎপাদন ও বিপণন সক্ষমতা বিবেচনা করে ধানবীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক একটি উৎপাদন পরিকল্পনা করতে হবে।
* পরিকল্পনা ও চাহিদা অনুযায়ী বিশুদ্ধ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছ থেকে নির্বাচিত জাতের প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভিত্তি বা প্রত্যয়িত বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
* বীজ উৎপাদনের যাবতীয় প্রযুক্তি মেনে বীজ উৎপাদন করতে হবে। বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে জাতের স্বাতন্ত্রীকরণ দূরত্ব ও বিজাত বাছাইয়ের ওপর।
* বীজ উৎপাদনের সময় স্থানীয় উপজেলা কৃষি অফিস বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন করবেন ও পরামর্শ দেবেন।
* উৎপাদনের পর কৃষক বা কৃষকদের নিজেদের যতটুকু বীজ লাগে সেটুকু সঠিকভাবে মজুত করবেন।
* অবশিষ্ট বীজ বিক্রির জন্য স্থানীয় পড়শি কৃষকদের চাহিদা নিয়ে তাঁদের কাছে উপযুক্ত মোড়কে বিক্রি করবেন। এরপরও অতিরিক্ত বীজ থাকলে তা স্থানীয় বীজ ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে সঠিক লেবেলিং তথা জাতের নাম, কৃষকের নাম ও মোবাইল নম্বর, উৎপাদনের তারিখ ইত্যাদি লিখে বিক্রির ব্যবস্থা করবেন। ফেসবুকে প্রচারের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানের কৃষকদের কাছেও কুরিয়ারে/অনলাইনে বীজ বিক্রি করা যেতে পারে। সবক্ষেত্রেই সততা ও বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে হবে।
* গ্রুপের মাধ্যমেও এভাবে বীজের ব্যবসা করা যায়। সেক্ষেত্রে দলগতভাবে পরিকল্পনা করে চাহিদা নিরূপণপূর্বক নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি বর্গা নিয়ে বা গ্রুপের সদস্যদের জমিগুলোতে বীজ উৎপাদন করা যায়। উৎপাদিত বীজ গ্রুপের কোনো এক সদস্যের বাড়িতে একত্রীকরণের মাধ্যমে বা কালেকশন সেন্টারে যাবতীয় সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পন্ন করার পর তা প্যাকেটজাত করে বিপণন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে একজন সদস্য বিপণনকর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। এতে গ্রুপের অন্যান্য সদস্যদের সময় ও শ্রম বাঁচবে, পরিবহণ ব্যয়ও সাশ্রয় হবে এবং একজন সদস্যের কর্মসংস্থান হবে। এরূপ বিপণনের ক্ষেত্রে পূর্বেই বিভিন্ন বীজ ব্যবসায়ীদের সাথে দরকষাকষি করে মূল্য স্থির করার পর সেখানে বীজ নিয়ে যেতে হবে। এভাবে একটি গ্রুপ ধানবীজ উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। পিএফএস বা ফার্মারস সার্ভিস সেন্টারের নামে সেসব বীজের ব্রান্ডিং হতে পারে। এতে ফার্মারস সার্ভিস সেন্টারের সেবা সহায়তাও সম্প্রসারিত হবে।